লুকোচুরির জীবন

সফিকুল ইসলাম

লুকোচুরির জীবন

সফিকুল ইসলাম

লুকোচুরির জীবন

সফিকুল ইসলাম

লুকোচুরির জীবন
প্রকাশক

www.srijonbd.com
srijoneditor@gmail.com
+৮৮০ ১৯১৪ ৬৯৬৬৫৮
বাড়ি : ৪৯৫, রোড : ৮, এভিনিউ : ৩
মিরপুর ডিওএইচএস, ঢাকা-১২১৬

গ্রন্থস্বত্ব © ২০২৩
সফিকুল ইসলাম

প্রথম প্রকাশ
মাঘ ১৪২৯, ফেব্রুয়ারি ২০২৩

প্রচ্ছদ
রাজিব দত্ত

বুক ডিজাইন
শেখ মাহমুদ ইসলাম মিজু

পরিবেশক
মাত্রা প্রকাশ, ৩০ নর্থ হল রোড, বাংলা বাজার, ঢাকা

মুদ্রণ
এস আর এল প্রিন্টিং প্রেস, ২৫/এফ বাবুপুরা, নীলক্ষেত, ঢাকা

মূল্য
২৪০ টাকা

Lukochuri Jibon
A collection of short stories by Shafiqul Islam

Price : 240.00 USD : 22.00
ISBN : 978-984-96008-7-9

উৎসর্গ

মোছাম্মৎ মোসলিমা আক্তার জামান সুজন। যে আছে আমার সমস্ত জুড়ে এবং সব কিছুতে। আমার সকল সফলতার পেছনে আমার পরিশ্রমের ভূমিকা আছে সত্য তবে তার চেয়েও বেশি সত্য হলো আমার পরিশ্রমের অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে ওর ভূমিকা, সময় ও ত্যাগ যা আমাকে অনেকখানি এগিয়ে দিয়েছে। সব ভার কাঁধে নিয়ে আমাকে দিয়েছে অফুরন্ত সময় আর নির্ভার থাকার সুযোগ। আমার দোষত্রুটিসহ আমাকে এত বছর সহ্য করার জন্য ওর অন্তত পাঁচটা পিএইচডি ডিগ্রি পাওনা হয়েছে। যদিও সে সনদ দেয়ার ক্ষমতা আমার নেই।

সূচিপত্র

আত্মউপলব্ধি	৯
ড্রয়ারের উপাখ্যান	১৬
দোয়া প্রার্থনা	২২
আনচান	৩০
দাম্পত্যরস	৪৪
হাবুডুবু জীবন	৫১
বাতির নিচে অন্ধকার	৫৭
বাতিকগ্রস্ত জীবন	৬৬
এক আনার জীবনের বাহাদুরি	৭৩
বাস্তবের রূপকথা	৭৯
শূন্য জীবনে ভালোবাসা	৮৭

আত্মউপলব্ধি

পানির পাম্প চালক মনির শুয়ে আছে চৌকিতে। শুয়ে শুয়ে হালকা ঝিমুনিতে আছে। মাথার ওপরে ফ্যান ঘুরছে। তবু কপালজুড়ে ঘাম, ঘামে পিঠও ভিজে যাচ্ছে। কী জানি বড় অফিসার আসবেন পরিদর্শনে। তাকে ফোনে জানানো হয়েছে। এ নিয়ে তার টেনশন চলছে। টেনশনে ঘাম ছাড়লেও তার তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব কমছে না। সে ভেবে পাচ্ছে না এত এত অফিসার থাকতে প্রধান অফিসারকেই কেন আসতে হবে এরকম পরিদর্শনে। তাও এই ভাঙ্গাচোরা পানির পাম্প হাউজে। কী এমন অপরাধ বা ভুল হয়েছে তার দ্বারা। সে কোনো দোষ খুঁজে পাচ্ছে না নিজের। ছোটখাটো ত্রুটি-বিচ্যুতি যা যা করেছে সেসব তার চোখে ভাসছে। চোখজুড়ে তার রাজ্যের ঘুম ভর করছে। মাথার ওপরে ফ্যানের বাতাসের কারণে তার ঘুম আরও ভারী হচ্ছে। আধো ঘুমে আধো জাগরণে স্বপ্নময় অবস্থার মধ্যেই হালকা ভয় ও আতঙ্কে কী কী ভুল তার দ্বারা হয়ে থাকতে পারে সেসব দৃশ্য তার চোখে ভাসছে।

পানির পাম্প প্রতিদিন সকাল ৫টা থেকে ৮টা এবং বিকাল তিনটা থেকে ৫টা পর্যন্ত চালানোর কথা। সে মাঝে মাঝে পানির পাম্প ছাড়তে ভুলে যায় বা দেরি হয়। সবসময় ভুলে যায় তা নয়। কোথাও হয়তো ঘুরতে গেলো, বাচ্চাদের স্কুলে নিয়ে যাবে, শ্বশুরবাড়িতে গেলে একদিন থাকতে হবে। তখন তো কোনো উপায় নেই। দুনিয়ার সবারে সে থামাইতে পারে, কিন্তু বউয়ের আবদার না করে কী করে? রাজা-বাদশাহরা যেখানে বউয়ের কথায় কাইত, সেখানে সেতো সামান্য পানির পাম্প চালক। তার ওপর শ্যালিকার আহ্লাদিপনা ঠাট্টা মশকরা তো আছেই। কে না চায় শ্যালিকার আশকারা! তাছাড়া শাশুড়ি খুব ভালো রান্না করেন। সেসব উপাদেয় সুস্বাদু খাবার ফেলে এই ভাঙা পানির

পাম্পে এসে রাত কাটাবে, তাই কী হয়? সুতরাং তার পানির পাম্প চালু করার কাজটি নিয়মিত হয় না। মহল্লার লোকজন এ নিয়ে তাকে ধরলে সে সাফ জানিয়ে দেয় 'পানির পাম্প ভালো ছিল না'। পাম্প কাজ করে না। পাম্প না কাজ করলে তার কী করার আছে? জিজ্ঞাসাকারী যদি একটু দুর্বল কিসিমের হয় তাহলে কথা নেই। পাম্প চালক মনির রীতিমতো খেকিয়ে ওঠে। 'পাম্প ছাড়লে ছাড়ুম না ছাড়লে নাই, তাতে তোর কি?' আর যদি জিজ্ঞাসাকারী শক্ত কিসিমের হয়, তবে নরম করে পাম্প মেশিন নষ্ট তথা যান্ত্রিক সমস্যার কথা ইনিয়ে-বিনিয়ে বলে। পানির পাম্প নিয়মিত না ছাড়ার খবর কি অফিসে গেলো? এজন্যই কি বড় অফিসার আসতেছে? এ প্রশ্ন তার মনে কাজ করে। স্বপ্নাচ্ছন্ন আধো ঘুমে থাকা মনিরের কপালে চিন্তার চিহ্ন।

যে ঘরে শুয়ে আছে ঘরটি ছোট। তার প্রায় অর্ধেকটা জুড়ে পাম্প মেশিন ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি। ধুলোবালির আস্তরণ পড়ে থাকে। একপাশে তার বিছানা যেখানে সে পাম্প চলার সময় শুয়ে-বসে থাকে। পাশেই বাড়ি, সেখানেই সে সাধারণত ঘুমায়। পাম্পঘরকে তাই তার নিজের ঘর মনে হয় না। সঙ্গত কারণেই সে পাম্প ঘর পরিষ্কার করে না, ঝাড়ু দেয় না। ময়লার আস্তর পড়ে থাকে, পুরোনো যন্ত্রপাতি বা পরিত্যক্ত মোটরপার্টসগুলো জং ধরে আছে। ফ্যানের বাতাসে ঘরজুড়ে মাকড়সার জাল খেলা করে। কোনো কিছুই তার গায়ে লাগে না। কোনো রকরেম গা বাঁচিয়ে পানির পাম্প চালু ও বন্ধ করে, আর ছোট্ট চৌকিতে সে শুয়ে পড়ে। আজ অফিসার আসবে, তবু সে এই রুম পরিষ্কার করে না। পরিষ্কারের বিষয় তার মাথায়ও আসে না। পানির পাম্প ঘর, এটার আবার পরিষ্কার কী? মেশিন চালাতে পারলেই হয়। এই স্যাতস্যাতে জীর্ণ ঘরে সে মাঝে মাঝে তাসের আসর বসায়। নিজে খুব একটা খেলে না। পাড়ার লোকেরা খেলতে আসে। তখন সে দেখে। পাড়ার যারা তাস খেলে তারা আসলে টাকা দিয়ে খেলে। এটাকে জুয়া বলে পাড়ার লোকজন সমালোচনা করে। কিন্তু সে এইসব মাথায় তোলে না। মাঝে মাঝে যে খেলায় জিতে তাকে পাঁচশো টাকা দেয়, তাতেই সে খুশি। পাম্প ঘর তো পড়েই আছে। পাড়ার লোকেরা একটু তাস খেলবে এর মধ্যে দোষের কী আছে? এলাকায় কয়েকজন মাদকসেবী আছে। ওরা রাতে এসে ঘরে ঢোকে। মনিরকে ডেকে নিয়ে আসে। প্রায় জোর করে দরজা খুলতে বলে। মাদকসেবী ঘরে ঢুকে মনিরকে বলে বাইরে দিয়ে দরজা লাগিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে। মনির দাঁড়িয়ে

থাকে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা। মাদকসেবীরা আরাম করে মাদক সেবন করে। কেউ ইয়াবা, কেউ ফেনিসিডিল কেউ বা অন্যকিছু। খেয়ে কেউ চলে যায়, কেউ এখানেই পড়ে থাকে রাতভর। মনিরকে কিছু টাকা ধরিয়ে দেয়। মনির কিছু বলে না। সব গোপন রাখে। মনির এসব খায় না। তবে মাঝে মাঝে একটু একটু চেখে দেখে। এসব ঘটনা মনির যতই গোপন রাখুক, পাড়ার মানুষ জেনে যায়। কারণ মাদকসেবীরাই এসব বলে বেড়ায়। মাথা যখন পুরো ঝিম ধরা তখন মাদকসেবীরা কী বলে আর কী বলে না, তার ঠিক নেই। হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে। মনির ভেবে পাচ্ছে না এই তাসের আড্ডার খবর বা মাদকের আখড়ার খবর কি কেউ দিয়ে দিল অফিসারের কাছে? স্বপ্নের মধ্যেই মনির ঘেমে নেয়ে যায় প্রায়।

পাম্প চলছে, ফ্যান ঘুরছে। মনিরের তন্দ্রা ভেঙে ভেঙে ধীরে ধীরে গাঢ় হচ্ছে। পাম্পের পানি যায় পুরো মহল্লায়। সবার বাড়িতে লাইন দেয়া। কারো বাড়িতে এক ইঞ্চি পাইপের লাইন, কারো বাড়িতে দেড় ইঞ্চি পাইপ, কারো বাড়িতে দুই বা তিন ইঞ্চি পাইপের লাইন। সবার বাড়িতে পানি সমান তালে যায় না। পানির সংযোগ নেয়ার সময় টাকা দিতে হয়। যত বড় মাপের পাইপ ততো বেশি ফি। সুতরাং পানি সবার এখানে একই পরিমাণে যায় না। ভাড়াটিয়াদের অনেকে এসব জানে না। তাই পানি কম করে যায় বলে তাদের টাংকি ভরে না। তিন ঘণ্টা পর পাম্প বন্ধ হয়ে যায়। তখন তারা পাম্পচালক মনিরকেই ধরে। যতই মনির ব্যাখ্যা দিক, মনিরের কথা পাবলিক শুনতে রাজি না। গালাগালি শোনা মনিরের নিত্য ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেকের বাড়িতেই পানির লাইন নেই। পাম্পের পাশে একটি কল আছে যেখানে পাম্পের পানির ট্যাপ আছে। ওখান থেকেই অনেকে পানি নিতে আসে। বস্তির মহিলারা, ভাড়াটিয়াদের বাড়ির কাজের লোকসহ নানান জন। পানি নেয়ার সময় পাম্পচালক মনির সবাইকে দেখে। তাদের কারো কারো ওপর মনিরের নজর পড়ে। সামনের টিনশেড বাড়ির কাজের মেয়ে পারুল এখান থেকে প্রতিদিন পানি নেয়। পারুলের সাথে মনিরের একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠে। প্রথম প্রথম আচমকা চোখাচোখি হওয়া বা দৃষ্টি বিনিময় হলেও পরে তা নিয়মিত ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। একে অপরের চোখের ভাষা বুঝে নেয়। হালকা কৌতুক, ঠাট্টা মশকরা করতে করতে একে অপরের প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকে। একদিন গায়ে জ্বর নিয়েই পানি নিতে আসে পারুল। পানির কলসি নিয়ে মাথা ঘুরে

পড়ে যায়। মনির তাকে তুলে কলসিসহ বাড়িতে দিয়ে আসে। সেই থেকে মনিরের প্রতি একটু বেশিই ঢলে পড়ে পারুল। এভাবেই দিনে দিনে এদের মধ্যে একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠে। মাঝে মাঝে পারুল সন্ধ্যার পরে দোকান থেকে মুদিমাল আনার কথা বলে বাড়ি থেকে বের হয়। ওই ফাঁকে মনির পাম্প ঘরে ঢুকিয়ে নেয় পারুলকে। দুজনের মধ্যে মানসিক সম্পর্ক ছাড়াও শারীরিক সম্পর্ক চলতে থাকে। একদিন পারুল পাম্প ঘর থেকে বের হওয়ার সময় তা প্রতিবেশী জলিল দেখে ফেলে। এ নিয়ে বাড়াবাড়ি হওয়ার কথা। কিন্তু জলিলকে মনির কব্জা করে ফেলে কিছু টাকা দিয়ে। জলিল চুপ করে যায়। সেই জলিল কি এসব কথা বলে দিয়েছে কিনা অফিসে সেটাও এখন চিন্তার বিষয় মনিরের।

অফিসার তো আসার কথা। আসতেছে না কেন? সময় যাচ্ছে না যেন! খোদা জানে কোন ঘটনা কীভাবে অফিস জেনেছে। মনির কোনো কূল কিনারা করতে পারে না। তার বউ ও দুই বাচ্চা পাশের বাসায়ই থাকে। এই দুই-তিনশো মিটার দূরেই তার বাসা। পানির পাম্পের সাথে যে বিদ্যুৎ মিটার সেখান থেকেই সে তার বাসায় বিদ্যুৎ লাইন দিয়েছে। এতে করে তার মাসিক বিদ্যুৎ বিল লাগে না। অফিসের নামে বিল হয়, সুতরাং অফিস পানির পাম্পের বিল দিয়ে দেয়। শুধু নিজের বাসায় লাইন দিয়েছে তা না। আশেপাশে আরও কয়েকটি বাসাতে সে পানির পাম্পের বিদ্যুৎ মিটার থেকে লাইন সংযোগ দিয়েছে। প্রতিটি বাড়ি থেকে সে ৫০০ টাকা করে নেয়। বিনিময়ে বাড়িগুলো ইচ্ছামতো বিদ্যুৎ ব্যবহার করে। অফিসের বিদ্যুৎ লাইন বিক্রি করে মনির টুপাইস কামাই করে। শুরুর দিকে এটাকে মনিরের চুরি মনে হতো। এখন আর সে তা মনে করে না। সারাদেশেই তো কত বড় বড় চুরি হয়। সেখানে তার সামান্য বিদ্যুৎ সংযোগ কোনো বিষয়ই না। সে তার মনকে বুঝিয়ে নিয়েছে। এই অনিয়মকে তার অতি স্বাভাবিক বিষয় মনে হয়। এই বিদ্যুৎ লাইন সংযোগের বিষয়টা কি কোনোভাবে অফিস জেনে গেছে? মনিরের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ঘুম আরও গভীর হয়।

ঘুমঘুম চোখেই মনির অপেক্ষা করতে থাকে অফিসার আসার। আসলে আসুক, না আসলে নাই। না আসলে আরও ভালো। শুনেছে এ অফিসার খুব কড়া। পাম্প মেরামতের বিল পাঠিয়েছিল কয়েকদিন আগে, এতে নাকি ১৪টা প্রশ্ন করেছে নথিতে। সামান্য পাম্প মেরামতের বিলে এত প্রশ্ন করলে হবে?

নগরজুড়ে কত পানির পাম্প, কত কত বিল। এসব বিল প্রশ্ন করে আটকালে পানির পাম্প চলবে? নগর চলবে? সব পানির পাম্প চালক যদি একযোগ হয়, আর কোনো প্যাঁচ লাগায়, পানি সরবরাহ না করে তখন অফিসার একা কিছু করতে পারবে? ভাবতে ভাবতে মনির স্বপ্নের মধ্যেই গোঙ্গাতে থাকে। প্রশ্নের জবাবে উত্তর দিতে থাকে। পাম্প যেহেতু মেশিন তা নষ্ট হতেই পারে। নষ্ট হলে মেরামত করা লাগবেই। জবাব দিতে দিতে মনির গোঙ্গাতে থাকে বটে। তবে মনে মনে এটাও ভাবে যে পানির পাম্প নষ্ট হয় বটে, তবে তা কয়েকমাসে একদুবার। কিন্তু মনির প্রতি পনেরো দিনেই একটা করে বিল পাঠায়। পানির পাম্প, পাইপ মেরামত, রাস্তা খুড়া ইত্যাকার বিল। নিয়মিত পাঠায়। কিছু বিল বাস্তব আর কিছু বিল ভুতুরে। না পাঠিয়ে উপায় কি? মাত্র ৯০০০ টাকা বেতন দিয়ে কি ঘর চলে? সংসার চালানো, বাচ্চাদের পড়াশোনা, ইত্যাদিতে অনেক টাকা খরচ হয়। সুতরাং এসব ভুতুরে বিল বানিয়ে পাঠিয়ে কিছু টাকা সে পায়। সবটা পায় না। কারণ অফিসের কেরানি যাদের মাধ্যমে বিল জমা হয় তারাই ভাগের টাকা মেরে দেয়। তাদেরকে না জানিয়ে কোনোভাবেই বাড়তি বিল পাঠানো যায় না। আচ্ছা, এসব অনিয়মের কথা কি জেনে গেছে, অফিসার? না হলে তিনি আসবেন কেন, তা ভেবে ঠিক ঠাহর করতে পারে না মনির।

পানির পাম্প ঘরে তাকে থাকতে হয় দীর্ঘসময়। যেহেতু শিফটিং ডিঁউটি নেই তাই ছুটি কাটাতে পারে না। এ নিয়ে আত্মীয়স্বজন সবাই ভুল বোঝে। মাঝে মাঝে রাতে থেকে যেতে হয়। দিনে পানির পাম্প না চললে রাত জেগেই তা চালাতে হয়। এতসব ঝামেলায় পরিবারকে সময় দিতে পারে না। বেশিরভাগ সময়েই মনির পাম্পের ভেতরে বসে থাকে বা পাম্পের বাইরে হাঁটাহাঁটি করে। বাসা কাছে হলেও খুব কমই যায়। ঘরে তার মন বসে না। বউয়ের নানান বিষয়ে অভিযোগ, সংসারের অভাব অনটন, বাচ্চাদের চাওয়া-পাওয়া মেটাতে না পারা, ইত্যাকার অভিপ্রায়, অনুযোগ লেগেই থাকে। এসব হাউকাউ তার ভালো লাগে না। এমনিতেই সামর্থের অভাবের কারণে মেজাজ গরম থাকে, তার ওপর সবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অভিযোগ অনুযোগে তার কান ঝালাপালা হয়ে যায়। তখন সে রেগে যায়। মানুষের এটা অমোঘ নিয়ম। যখন আর পারে না তখন রেগে যায়। তেমনই মনির রেগে গিয়ে বাসায় বাসন ছুড়ে মারে। বউ তখন আরও ক্ষেপে। মুরোদ নাই ব্যাটার রাগ তো কম

না। কথায় কথা বাড়ে, উত্তেজনা তুঙ্গে উঠে। হাত তোলা পর্যন্ত গিয়ে গড়ায়। তখন সংসার থেকে রাগ করে মনির বিদায় নেয়। কয়েকদিন বাসায় যায় না। দোকান থেকে রুটি কিনে খায় আর পাম্পের ঘরে ঘুমায়। কয়েকদিন পরে রাগ পড়ে গেলে বাসায় ফেরে। তখন কথায় কথায় বউ ঠিশারা করে হোক আর সিরিয়াস করে হোক বলে যে, বাইরে মানুষ থাকলে ঘরে আসার কী আর দরকার পড়ে! তখন মনিরের বুকের ভিতরে ধক করে ওঠে। বউ কি তাহলে পারুলের কথা জেনে গেলো? জলিল তো বলার কথা না। তাহলে জানলো কী করে? আসলে বউদের কাছে কিছু লুকানো যায় না। কুকুরের ঘ্রাণশক্তি প্রখর, আর বউদের অনুধাবন শক্তি। মুখ-চোখ আর কথার ধরন দেখেই বউরা বলে দিতে পারে স্বামীরা কখন কোথায় কী ধরনের কাজে ছিল। মনির মনে মনে ভয় পায়। ভাবে, বউ কি তাহলে অফিসে গিয়ে আমার নামে কোনো অভিযোগ দিয়েছে? নিজের ভেতরেই সব কথা উথলে উথলে উঠছে। যার মনে যা ফাল দিয়ে ওঠে তা—প্রবাদের মতোই মনিরের মন আজ। অফিসার কখন আসবে পরিদর্শনে কে জানে? মনিরের আজ তন্দ্রা রোগে ধরেছে। শুয়ে শুয়ে ঝিমাচ্ছে আর স্বপ্ন ও বাস্তবতার এক খেয়ালি অবস্থাতে সময় যাচ্ছে।

হঠাৎ দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। মনির ঘুমচোখে বুঝতে পারে না যে এটা দরজাতে কেউ কড়া নাড়ছে নাকি অন্য কোথাও। আরও জোরে দরজা কড়া নাড়ার আওয়াজ পায় এবং তাকে কেউ ডাকছে বলে শুনতে পায়। হতচকিত হয়ে দ্রুত উঠে দরজা খোলে। সামনে দাঁড়িয়ে সহকারী প্রকৌশলী ও অফিসার। মনির ভয় পেয়ে যায়। অফিসাররা ঘরে আসে। একে একে সব দেখে। রুমটি অপরিষ্কার কেন, মাকড়সার জাল কেন, ময়লা আবর্জনা কেন, পাম্প মেশিনে জং ধরা কেন, ইত্যাকার প্রশ্নে প্রশ্নে মনিরকে জর্জরিত করে। মনির চুপ থাকে। মুখ দিয়ে কথা বের হয় না। কেবল আস্তে করে বলে, 'স্যার সব ঠিক করে নেবো।' তারা আরও জানতে চায় কত বাড়িতে পানি যায়, সব লাইন ঠিক আছে কিনা, পানির প্রবাহ ঠিক থাকে কিনা, প্রতিদিন পানি সময়মতো ছাড়া হয় কিনা, এলাকার কারো কোনো অভিযোগ আছে কিনা। মনির আমতা আমতা করে ভয়ে ভয়ে সব প্রশ্নেরই উত্তর দেয়। বিদ্যুৎ কানেকশন ঠিক থাকে কিনা, এ পাম্পের বিদ্যুৎ বিল বেশি আসে কেন, আশেপাশের কোনো হোল্ডিংয়ের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ আছে কিনা ইত্যাকার প্রশ্ন করে করে কিছু নোট নেয় অফিসাররা। ঠিকমতো দায়িত্ব পালন করতে বলে যায়। তারপর চলে যায় সবাই।

মনিরের যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে। কেন বড় স্যারেরা আসলো কেন কী প্রশ্ন করলো, পরে কী হবে এসব নিয়ে সে ভাবতে চায় না। তাছাড়া বড় স্যারের আচরণ ও ব্যবহার তার ভালো লাগে। তার শারীরিক খবর জানতে চায়, কোনো কষ্ট আছে কিনা জানতে চায়। সে লাজুক হাসিতে কোনো উত্তর দেয়নি বটে, তবে তার ভালো লেগেছে যে কেউ একজন তার খবর নিয়েছে। বাড়িতে গিয়ে আরাম করে গোসল করে, খেয়ে দেয়ে একটা ঘুম দেয়। তারা এসে চলে গেছে মানে মনির তার রাজ্য আবার ফিরে পেয়েছে। তবু কয়েকদিন একটু ভয়ে থাকে, চাকুরি থেকে তাড়িয়ে দেবার কোনো পত্র আসে কিনা। কোনো পত্র বা ফোন কিছুই আসে না। সে মনে মনে নিজেকে বকা দেয়। বড় স্যার আসলো, তার কোনো ভুলই ধরলো না প্রায়। কোনো শাসন বা তিরষ্কারও করলো না। অথচ সেদিন সে শুয়ে শুয়ে কতকিছু ভেবে ফেলেছিল। জীবনের যত অপরাধ, ভুল-ত্রুটি তার মনের মধ্যেই খেলেছিল। সব সিনেমার মতো ভাসছিল। মানুষের মন এমনই। যেন স্বচ্ছ আয়না। নিজের কাছে সে ধরা খায়, সবসময় সবখানে। বুকের ভেতরে বাজে সকল কাজের ও অকাজের কর্মঘণ্টা ও দৃশ্যকল্প। বড় স্যার ধরুক বা না ধরুক, মনির জানে মনির কী।

যাই হোক, দিন পনেরো যাবার পরে সে আবার আগের মতো শক্ত হয়ে বসে। ভয় কেটে যায়। আবার তার কাজকর্ম আগের মতোই চালিয়ে যেতে পারবে। সেই বিদ্যুৎ চুরি, পারুলের সাথে লটরপটর, বউয়ের সাথে লুকোচুরি-রাগ-গোস্বা, মাদক আর জুয়ার আড্ডা বসিয়ে টুপাইস কামানো, হোল্ডিং মালিকদের মাঝে মাঝে ধমক দেয়া সব চলবে। যখন খুশি পাম্প চলবে, যখন খুশি বন্ধ করবে। কেউ তাকে কিছু বলতে আসলে খেঁকিয়ে উঠবে। দুনিয়ার সবাই রাজা নিজ আয়ত্বের রাজত্বে। মানুষ এমনই। অভ্যাস ছাড়তে পারে না, স্বভাব ছাড়তে পারে না। আর দীর্ঘদিন ধরে অনিয়ম ও ভ্রষ্টতা চলতে থাকলে মানুষ তাতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। মনে হয় যা করছে সব স্বাভাবিক। তাতে জগতের ক্ষতি হলেও সে নিজের মোহ থেকে সহজে সরতে পারে না। মনিরেরা তথা মানুষেরা তেমনই।

ড্রয়ারের উপাখ্যান

আমি একটি টেবিলের ড্রয়ার। আমার জন্ম এখানে নয়, সুদূর পার্বত্য চট্টগ্রামের কোনো এক পাহাড়ে। সেগুন গাছের কাঠ ছিলাম। আমাদেরকে বুক চিড়ে কেটে কাঠ বানানো হয়। মানুষের ধারণা, আমাদের ব্যথা হয় না। আসলে কাঠ হলেও আমরা ব্যথা পাই। কেটেই ক্ষান্ত হয় না। সুন্দর ফিনিশিং দেয়ার জন্য আরও কতবার যে আমাদের চামড়ার উপরিভাগ বা ভেতরের ভাগ নানান ঢঙে ছেনানো হয় তার কোনো ইয়ত্তা নাই। মানুষের মনমতো না হওয়া পর্যন্ত আমাদের ওপর কর্তন, ঘর্ষণ, মর্দন সব চলে। এসব ঘর্ষণ-মর্দনে যে আমাদের জীবন বের হবার যোগাড় হয়, আর কত কষ্ট হয় তা হয়তো মানুষ জানে না। জানলেও যে বন্ধ করতো তা নয়, মানুষের এক স্বভাব। অন্য প্রাণী হত্যা ও এদেরকে যাচ্ছেতাই মতো ভোগ ও ব্যবহার করতে মানুষের আনন্দের জুড়ি নেই। 'বিধাতার সেরা জীব মানুষ আর মানুষ যে কোনো প্রাণী হত্যা করতে পারবে ও ইচ্ছামতো ভোগ ব্যবহার করতে পারবে'—এসব কথা মানুষ নামের প্রাণীরা নিজেদের মধ্যে প্রচার করে, বিশ্বাস করে আর আমাদেরকে যা খুশি তা করে। সামান্য টেবিলের ড্রয়ার হয়ে বা কাঠ হয়েও আমরা বুঝতে পারি মানুষের মতো নিষ্ঠুর প্রাণী আর হতে পারে না। যখন সেগুন গাছ হিসেবে ছোট ছিলাম তখনও কিন্তু মানুষ আমাদের খুব যত্ন নিয়েছিল, নিয়মিত আমাদের পরিচর্যা করতো। সার্বক্ষণিক বা রোজকার খেয়াল করতো। খাওয়া-পরার কোনো কমতি করতো না। যখনই বড় হলো আমার মূলসূত্র সেগুন গাছ, মালিক তা কেটে বেচে দিল। তথা মানুষ যার যত্ন করে, আদর করে আবার তাকেই কেটে টুকরো টুকরো করতে দ্বিধা করে না। মানুষের মাঝে বিধাতা নিষ্ঠুর রুঢ়তা ও রসিকতার বৈশিষ্ট্য বহাল রেখেছেন। তাই মানুষ এসব পারে।

যাই হোক, সেই সেগুন কাঠ করাতকল মালিক নিয়ে চিড়লো। পরে বেচে দিল ফার্নিচারের দোকানে। ফার্নিচারের দোকানদার নানান কাটাকুটি ফিনিশিংয়ের পরে বানালো টেবিল। সেই টেবিলের ড্রয়ার হলাম আমি।

আমার অবস্থান এখন বড় সরকারি অফিসের বড় স্যারের রুমে। আমার কপাল ভালো। বড় রুম পেয়েছি, এসি রুম পেয়েছি। এ রুমে আসে দেশের বড় বড় হর্তাকর্তারা। বড় স্যার যে টেবিলে বসেন, সেই টেবিলেরই ড্রয়ার আমি। বড় স্যার আমাকে ব্যবহার করেন। আমাতে তার নিত্য প্রয়োজনীয়, অপ্রয়োজনীয় সকল কাগজপত্র, স্টেশনারি, এটা সেটা সব রাখেন। বড় স্যারের কাছে যারা আসে, আর কথাবার্তা বলে সব আমি শুনি। বড় স্যার বা মানুষের ধারণা আমি জড় পদার্থ, আমার ইন্দ্রিয়—চোখ, কান, নাক, জিভ ও ত্বক ইত্যাদি নেই। বাস্তবে আমার সবই আছে। মানুষ জানে না যে এসব আমার আছে। মানুষের ধারণা, আমরা কিছু বলতে পারি না। কিন্তু আমি সব বলতে পারি। হয়তো মানুষ শোনে না। বা বোঝে না। মানুষের না শোনার বা না বোঝার অক্ষমতা আমাদের ওপর চাপিয়ে দেয়! কী হাস্যকর মানুষ!

যাই হোক, এ অফিসে আমি ছয়বছর ধরে আছি। এ পর্যন্ত আমি কয়েকজন বড় স্যার পেয়েছি। বড় স্যারদের চরিত্র, আচার আচরণ ও স্বভাব ভিন্ন ভিন্ন রকম। তাই তারা আমাকে নানানভাবে ব্যবহার করেছে। আমি সানন্দে সেবা দিয়ে যাচ্ছি। সেগুন কাঠ বলে আর ডিজাইন সুন্দর বলে এ টেবিল কেউ পরিবর্তন করছে না। প্রত্যেক বড় স্যারেই টেবিল ও আমি ড্রয়ারকে পছন্দ করে। আমাদেরকে যিনি প্রথম কেনেন, তিনি একটু সৌখিন প্রকৃতির ছিলেন। যে অফিসেই যান তার কাজ হলো টেবিল পাল্টে বড় সুন্দর টেবিল কেনা। ছয় বছর আগে তিনিই আমাদের কিনেছিলেন। বড় স্যারেরা চাইলে অফিসের যে কোনো কিছু যে কোনো সময় পরিবর্তন হয়ে যায়। টেবিল পরিবর্তন হতেও সময় লাগে না। বাসার জন্য হলে হয়তো তিনি ২০-৩০ হাজার টাকার মধ্যে একটা টেবিল কিনতেন। এমনটা হলেই অফিসেও চলার কথা। কিন্তু বড় স্যারের শখ বলে কথা। সরকারি টাকা যাবে, পকেট থেকে যাবে না। তাই পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেগুন কাঠ সংগ্রহ করে, এমন ব্রান্ডের ফার্নিচারের দোকান থেকে দেড় লক্ষ টাকা দিয়ে কিনেছেন। অথচ নিজের বাসার বিষয় হলে তিনি কখনোই ৫০ হাজার টাকার বেশি খরচ করতেন না। যাই হোক, বেশি টাকা হলেও টেকসই হয়েছে, অফিসের সৌন্দর্য বাড়িয়েছে। ছয় বছর

ধরে সার্ভিস দিয়ে যাচ্ছি, আরও দিয়ে যাবো। ড্রয়ার হিসেবে আমার খুব গর্ব হয়। কত কিছুর যে স্মৃতিস্বাক্ষর আমি। একেক স্যার একেকরকম। তাই ড্রয়ার হিসেবে আমার অভিজ্ঞতাও ভিন্ন ভিন্ন।

প্রথম যেই স্যার ছিলেন, তিনি খুব সৌখিন ছিলেন। এখানে তিনি আবার প্রচুর পারফিউম ব্যবহার করতেন। তাঁর বাসায় নিশ্চয়ই পারফিউম ছিল। থাকলেও আমি ড্রয়ারের ভিতর একটি পারফিউম বোতল সবসময় রাখতেন। আমার ভিতর সারাক্ষণ সুগন্ধি ছড়িয়ে থাকতো। তিনি দিনে কয়েকবার আমাকে ব্যবহার করতেন। জরুরি পত্র, স্লিপ, বাজার সদাইয়ের কাগজ, কলম, পেন্সিল, ব্যাংকের চেক বই, ইত্যাকার নানান ধরনের জিনিস তিনি রাখতেন। তিনি আবার সব গুছিয়ে রাখতেন। ছোট একটা ড্রয়ার আমি, তবু মালিকের গুছিয়ে রাখাতে আমার একটু ফুরফুরে লাগতো। তবে এই বড় স্যার একটু রাগী টাইপের লোক। তিনি প্রতিবার ড্রয়ারটা লাগানোর সময় এমন জোরে ধাক্কা দিতেন যে আমার কষ্ট হতো। প্রতিবার মনে হতো একটা চপেটাঘাত খেলাম। কিন্তু কিছু করার নেই। যতই কান্নাকাটি করি, মানুষের তা বোঝার ক্ষমতা নেই। যাই হোক একবার এক জরুরি কাগজ আমার ভেতরে রাখলেন। তালা দিয়ে রাখা আমি ড্রয়ারকে। এরকমতো প্রায়ই রাখে। গভীর রাতে ঘুমাচ্ছি। হঠাৎ দেখি কে যেন তালা খোলার চেষ্টা করছে। অনেক গুতাগুতি করে মোটামুটি কিছুটা ভেঙেই আমাকে খুলে ফেলে। খুলেই ওই কাগজটা নিয়ে যায়। ওটা ছিল অফিসের এমএলএসএসের অপকর্মের প্রমাণ। সে ওটা নিয়ে যায়। আমার তো আর কিছু করার নেই। পরেরদিন এ নিয়ে অনেক হৈচৈ হয়েছে। কিন্তু কে নিলো তা কেউ বুঝতে পারলো না। তখন সিসি ক্যামেরা ছিল না। আর দারোয়ানরা তো ঘুমায় সারারাত পড়ে পড়ে। যে নিয়েছে সে নিশ্চয়ই দারোয়ানদেরকে কব্জা করেই নিয়েছে। সুতরাং সেই এমএলসএসের কিছুই হলো না।

এরপরে যেই স্যার এলেন তার আবার আরেক নেশা। তিনি সারাদিন সিগারেট টানেন। সিগারেটের প্যাকেট রাখেন আমার মধ্যে। সিগারেটের গন্ধে আমার শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে মরে যাবার উপক্রম। কাঠের তৈরি ড্রয়ার আমি। আমি সইতে পারি না এত ঝাঁঝ, তবু মানুষ কীভাবে খায় আর নাক দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ে এটা আমার মাথায় ধরে না। মানুষের মাথায় এটা ঢুকবে না যে আমারও মাথা আছে, আছে ইন্দ্রিয় যার কারণে ধোঁয়া ও সিগারেটের ঝাঁঝ

সইতে পারি না। সুযোগ পেলেই স্যার রুমে বসেই সিগারেট ফোঁকেন। পুরো ঘরে সিগারেটের গন্ধ। স্যারের আরেকটা সমস্যা হলো মানুষের কাছ থেকে খাম গ্রহণ করেন। খামে খামে ড্রয়ার ভরে যায়। মাঝে মাঝে টাকার বান্ডেল। কত টাকা কত দিক থেকে যে আসে! দেশের হোমরা-চোমরা লোকেরা আসে আর খাম দিয়ে যায়। যেসব সেবা এমনিতেই হবার, তবু খাম দিয়ে যায়। যারা দেয় না তাদের কাজও হয়, যারা দেয় তাদেরও হয়। ফাউ ফাউ টাকা দিয়ে গেলে অনেকেই ফেরত দেবে না। আমাদের এই স্যারও সেইরকম। অযথাই মানুষ টাকা দিয়ে যায়। স্যারও আস্তে করে ড্রয়ারে রেখে দেয়। মানুষের জগতে এটার অনেক নাম আছে। কেউ বলে ঘুষ কেউ বলে স্পিড মানি। কেউ বলে অবৈধ কেউ বলে প্রয়োজন। নাম যাই হোক, স্যারের মন জানে যে এই টাকা লিগ্যাল না। টাকার নেশা বড় নেশা। যার ভিতরে এ নেশা আছে সে তা ছাড়তে পারে না। খাম নেওয়া ও সিগারেট টানা ছাড়াও স্যারের আরেকটা নেশা ছিল। প্রচুর চিঠি আসতো। সেসব চিঠি আমি লুকিয়ে পড়তাম একটু একটু। বড় গভীর প্রেমের পত্র। পড়তে পড়তে আমার লজ্জা লাগতো। লজ্জায় মুখ লাল হয়ে এলে আমি না পড়েই রেখে দিতাম। এসব চিঠি আবার একজনের কাছ থেকে আসতো না। কয়েক জায়গা থেকে আসতো। জগতের সবাইকে ফাঁকি দিয়ে এলেও আমি ড্রয়ারের কাছে স্যারের কোনো গোপনীয়তা নেই। স্যার গোপন করতেই আমাকে তালা দিয়ে সব রাখে। আর এই ফাঁকে আমি সব পড়ে ফেলি। বেড়ায় ক্ষেত খাওয়ার দশা। মানুষ মানুষকে ভরসা পায় না, কিন্তু কাঠের ড্রয়ারকে ভরসা করে, তালাকে ভরসা করে! তাহলে কি লোহার তালা আর কাঠের ড্রয়ারের চেয়ে মানুষ অবিশ্বস্ত? আমার স্যারও মনে হয় অবিশ্বস্ত। একদিন স্যার কন্ডমের প্যাকেট এনে ড্রয়ারে রাখলেন। সাথে সিগারেটের প্যাকেট। সিগারেট খান সেটা ঠিক আছে। কিন্তু কন্ডমের প্যাকেট কেন আনলেন তা তো বুঝলাম না। স্যারের বউ থাকেন চট্টগ্রাম শহরে। স্যার এখানে সিংগেল থাকেন। নাকি বউয়ের কাছে যাবার জন্য আগেই কিনে রেখেছে কে জানে! ড্রয়ার হিসেবে ড্রয়ারে যা রাখে তা পড়তে পারি, দেখতে পারি। কিন্তু স্যারের মন তো আর পড়তে পারি না!

একেক স্যার আসে আর আমি নতুন নতুন অভিজ্ঞতা হয়। এরপরে যে স্যার আসলেন সেই স্যার একটু অন্যরকম। সারাক্ষণ মানুষ গিজগিজ করে রুমে। সবার জন্য দরজা খুলে দিয়েছেন। সবাই গণহারে রুমে ঢুকে পড়ে।

মানুষের যে কতরকম সমস্যা থাকে তা এই স্যার না আসলে জানতামই না। আমজনতা যখন তখন হাবিজাবি নানান সমস্যা নিয়ে আসে। সবার সব কথা এই স্যার মন দিয়া শোনেন। পিকিউলিয়ার সব সমস্যা মানুষের। ড্রয়ার হিসেবে আমার অবাক লাগে যেসব সমস্যা পাবলিক নিজেরাই বাড়িতে বসে সমাধান করতে পারে, সেইসব সমস্যা নিয়েও আসে তারা। দুই ভাইয়ের ঝামেলা বা প্রতিবেশীর ঝামেলা এসবের বেশিরভাগ তো নিজেরাই সমাধান করতে পারে, কেন যে অফিসে আসে! স্যার সবাইকে বোঝানের চেষ্টা করেন। মাঝে মাঝে রেগেও যান। কারণ কিছু পাবলিক এমন ত্যাড়ার ত্যাড়া যে 'বিচার মানি কিন্তু তালগাছটা আমার'। এরকম পাবলিক দিয়ে তো আর সমাধান হবে না।

যেসব স্টাফ অফিস ফাঁকি দেয়, মানুষকে সেবা দিতে গিয়ে হয়রানি করে সেসব স্টাফদেরকে সতর্ক করেন, না পরিবর্তন হলে স্যার বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। স্টাফরা অনুনয় বিনয় করে এসে ক্ষমা চায়, একজনের বিরুদ্ধে আরেকজন নালিশ করে। সেসব নালিশ এই স্যার আমার ভেতর তালা দিয়ে রাখেন। কত স্টাফ যে কতরকম অভিযোগ করে! ঘুষের অভিযোগ তো আছেই, পাওয়া যায় নারী কেলেঙ্কারির অভিযোগও। বেনামি অভিযোগও অনেক আসে। একজনের বিরুদ্ধে আরেকজন বলে। সে কারণে আসলে সবার আকাম কুকামই প্রকাশ হয়ে পড়ে। স্যার মনে মনে কৌতুকবোধ করেন।

এরই মাঝে এক স্যার পেয়েছিলাম তিনি কেবল কবিতা লিখতেন। অফিসের কাজ করতেন মন দিয়ে, কিন্তু ফাঁক পেলেই সন্ধ্যার পরে বা অবসরে কবিতা লিখতেন। সেইসব কবিতা আবার আমার ভেতরে রাখতেন। আমি পড়তাম। কঠিন কঠিন ভাষা। তাই বুঝতে পারতাম না সব। তিনি প্রচুর চকলেট খেতেন। চকলেট আমার ভেতরে রাখতেন। চকলেট তো আমার খাবার না। তাই খেতে পারতাম না। তবে স্যার খুব আয়েশ করে চকলেট খেতেন। কেউ এলে বিশেষ করে মেয়েরা বা বাচ্চারা এলে স্যার চকলেট খুলে দিতেন। বাচ্চারা খুব খুশি হতো। বড়রা একটু বিব্রত হলেও চকলেট নিতো ও খেতো।

আমার ভেতর বাহির সুন্দর হলেও আমাকে ভেতর থেকে ঘুণপোকায় ধরেছে। বাইরে থেকে বোঝা যায় না। আমি যথাযথ সেবা দিয়ে যাচ্ছি। সেগুন কাঠ বলে যে আমারে গুণপোকা কাটার কথা না। কিন্তু মিস্ত্রি বানানোর সময় ড্রয়ারের একদম ভিতরে এক টুকরো অন্য কাঠ ঢুকিয়ে দিয়েছে। মানুষ এত

সন্তর্পণে অন্যকে ফাঁকি দেয় যে তা খুব কমই বোঝা যায়। যখন বোঝা যায় তখন আর কিছু করার থাকে না। সে যাই হোক, ঘুণপোকায় আমার ভেতর খেয়ে একদম ঝাঝরা করে ফেলেছে। ভেতরে যত কষ্টই থাক, মুখবুজে সেবা দিয়ে যেতে পারলেই সবাই খুশি। আমি নিশ্চিত যেদিন সবাই দেখবে আমাকে ঘুণপোকায় খেয়ে ফেলছে সেদিনই আমাকে ডাস্টবিনে নিয়ে ফেলে দেবে। অতি যত্নে এসি রুমে রাখা আমাকে নোংরা ডাস্টবিনে ফেলতে মানুষের একটুও মায়া লাগবে না। সৃষ্টিজগতের এসব নিষ্ঠুরতাও রুঢ়তা আমাকে বড় দাগা দেয়। ড্রয়ার হিসেবে আমি ধন্য যে দীর্ঘদিন সেবা দিয়ে যাচ্ছি। একদিন হয়তো ডাস্টবিনে বা মাটিতে মিশে যাবো। মাটি থেকে উৎপত্তি মাটিতেই শেষ। মানুষেরও এরকমই। মানুষের সাথে আমাদের জীবনের কী মিল!

দোয়া প্রার্থনা

মসজিদে দোয়া শুরু হয়েছে। সভাপতি সাহেব হজ্জ থেকে ফিরেছেন। তাই সবার জন্য এই আয়োজন। জুমআ শেষে দোয়া হবে মর্মে আগেই এলান দেওয়া হয়েছে। সফেদ দাড়ির ইমাম সাহেবের শাদা পাঞ্জাবিতে মুখমণ্ডলে নুরানি ভাব ফুটে উঠেছে। পুরো মুখ উজ্জ্বল লাগছে। পান খেয়ে মুখ লাল করে রাখাতে ঠোঁট ও দাঁত কিছুটা খয়েরি রঙ ধারণ করেছে। চোখ বন্ধ করে তিনি কুরান তিলাওয়াত, দরুদ পাঠ ও ইস্তেগফার পাঠ করেছেন। 'আল্লাহুম্মা সাল্লিয়ালা' বলে তিনি মিলাদ শুরু করলেন। সুরে সুরে সবাই মিলাদ পড়ছে। ধ্বনি-প্রতিধ্বনিতে পুরো মসজিদ গমগম করছে। একটা আলাদা ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য বিরাজ করছে।

ইমাম সাহেব সুন্নি ঘরানার লোক। তাই মিলাদে কিয়াম করেন। তথা দাঁড়িয়ে দরুদ শরিফ পড়েন। ইয়া নবি সালাম আলাইকা, ইয়া রাসুল সালাম আলাইকা, ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা, সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা। মুসল্লিদের অনেকের আবার দাঁড়িয়ে মিলাদ পড়াতে অনীহা। তারা দেওবন্দ মাদ্রাসাপন্থী। তাদের কেউ কেউ বসেই পড়েন। দাঁড়ান না। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আছেন মধ্যপন্থী। যেখানে ইমাম সাহেব দাঁড়িয়ে পড়েন, তারাও দাঁড়িয়ে পড়েন। যেখানে ইমাম সাহেব বসে পড়েন, সেখানে তারা বসে পড়েন। এ নিয়ে কোনো বাড়াবাড়ি করেন না।

আজকের ইমাম সাহেব দাঁড়িয়েই মিলাদ পড়ছেন। ফাঁকে ফাঁকে আবার ওয়াজও করেন। হুজুর আবার পড়ছেন—

বালাগাল উলা বি—কামালিহী
কাশাফাদ্দুজা বি—জামালিহী

হাসুনাত জামিউ খিসালিহি
সাল্লু আলাইহি ওয়া আলিহী।
[যিনি (সাধনায়) পূর্ণতার শেষ প্রান্তে পৌঁছেছেন,
যাঁর সৌন্দর্যের আলোকে অন্ধকার দূর হয়েছে,
যাঁর আচরণ-ব্যবহার ছিল সৌন্দর্যের আকর,
দরুদ তাঁর এবং তাঁর বংশধরগণের ওপর।]

হুজুর গলা উঁচু করে জানান যে, এ দরুদটি লিখেছেন শেখ সাদি (রহ)। ইতিহাস থেকে জানা যায়, হযরত শেখ সাদি (রহ) এই দরুদ শরিফের প্রথম দুই লাইন লেখার পর কী লিখবেন তা তিনি ভেবে পাচ্ছিলেন না। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ তন্দ্রাছন্ন হয়ে গেলেন। তন্দ্রার ভাব আসলে স্বপ্ন দিদারে তিনি রাসুলের (সা) দেখা পান। প্রিয় নবিজি (সা) স্বয়ং তখন সাদিকে (রহ) বলেন—

হে সাদী! তুমি লেখো—
'হাসুনাত জামিউ খিসালিহী,
সাল্লু আলাইহি ওয়া আলিহী।'

তার মানে শেখ সাদি নবিজিকে ভালোবাসতেন। ভালোবাসায় আকুল হয়ে নবিজির ওপর দরুদ রচনা করতে যান এবং এক রচনা করতে গিয়েই ধ্যানে নবি করিমের (স) সাক্ষাত পেয়ে যান। ইমাম সাহেব বলেন, সারা বিশ্বে এ দরুদ শরিফ অত্যন্ত জনপ্রিয়। এত অল্প কথায় এর চাইতে ভালো ছন্দময় দরুদ আর হয় না।

মিলাদ কিয়াম শেষে ইমাম সাহেব দোয়া শুরু করলেন। ইমাম সাহেবের সাথে সবাই হাত তুললো। শুরুতেই যা কিছু পাঠ হয়েছে তা কয়েক হাজার গুণ বাড়িয়ে এর ছওয়াব যেন মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইসে সাল্লামসহ সকল নবি রাসুল পান, সে দোয়া করলেন। এক ফাঁকে পৃথিবীর সকল মুসলমানকে আল্লাহ যেন ভালো রাখেন, সুস্থ রাখেন ও সমৃদ্ধি দান করেন, এমন দোয়াও করলেন। দোয়া করতে করতে এক পর্যায়ে সবাইকে একবার সূরা ফাতিহা, সুরা এখলাছ তিনবার ও দরুদ শরিফ একবার পড়তে বললেন। পড়া শেষ হলে সবাইকে নিজ মকসুদ বা আশা কল্পনা করে আল্লাহ পাকের কাছে চাইতে বললেন। উপস্থিত মুসল্লি সকলে চোখ বন্ধ করে নিজ নিজ দোয়ার দরখাস্ত আল্লাহ পাকের কাছে পেশ করছেন। বড়ই মনোরম সে দৃশ্য—

সামনে বসা চেয়ারম্যান সাহেব চোখ বন্ধ করে বিড়বিড় করে আল্লাহর

কাছে চাইলেন, 'হে আল্লাহ আমাকে তুমি সামনের চেয়ারম্যান ইলেকশনে জিতিয়ে দাও, আমার প্রতিদ্বন্দ্বী ফারুক যেন কোনোভাবেই নমিনেশন না পায় সে ব্যবস্থা করে দাও, আর আমার বখাটে ছেলেটাকে একটু শান্ত করে দাও'। দূরে বসা ফারুকও দোয়া করলো, 'হে প্রভু, তুমি মেহেরবান, কত কষ্ট করে বছরের পর বছর রাজনীতি করতেছি, তুমি আমাকে চেয়ারম্যান ইলেকশনে নমিনেশন পাওয়ার ব্যবস্থা করে দাও। ও চেয়ারম্যান হওয়ার ব্যবস্থা করে দাও।'

একটু দূরে বসা মসজিদের মুতাওয়াল্লি দোয়া করলেন, 'আমার ছেলেটা পুলিশে চাকরি করে, গত তিন বছরে বাড়িতে তিনতলা ভবনের কাজ শুরু করেছে। ভবনটা যেন আগামী বছরের মধ্যে তিনতলা করতে পারে, সে ব্যবস্থা করে দাও, তার সুযোগ সুবিধা বাড়িয়ে দাও আর তাকে সুস্থ রেখো।'

এরপরে বসা বৃদ্ধ মুসল্লি রহমান দোয়া করলো, 'প্রতিবেশী রাজীবের সীমানা পেরিয়ে যেটা দখল করেছি, সেটা যেন দখল থাকে, কোনোভাবেই যেন সে আমার সাথে পেরে না ওঠে। আমার ছেলেটা দুবাই থাকে, তার ইনকাম বাড়িয়ে দাও। যেন দখল করা জায়গায় একটা ভবন করতে পারি, আর আমাকে আমার স্ত্রীকে সুস্থ রেখো, যেন সব দেখে যেতে পারি।' দূরে বসা রাজীব দোয়া করলো, 'হে আল্লাহ, রহিম রহমান, তুমি তো সবসময় বঞ্চিতের পক্ষে। তুমি রহমানের অন্যায়ের বিচার করো। সে আমার জায়গা দখল করে রেখেছে, তার হাত পা তুমি লুলা করে দাও। যেন আমি গিয়ে আমার জায়গা পুনরায় দখল নিতে পারি।'

এরপরে বসা মাসুম নামের লোকটি দোয়া করলো, 'হে আল্লাহ তুমি আমাকে মামলাটায় জিতিয়ে দাও, আমি জানি যে মামলাটা মিথ্যা মামলা। তবু তুমি আমাকে জিতিয়ে দাও। পাশের আফিল খুব বাড় বেড়েছে, ওকে শান্ত করতে হলে কিছুদিন জেল খাটাতে হবে। তোমার কুদরত ছাড়া এ মামলায় জেতা সম্ভব না, জজ সাহেবের মনটা নরম করে দাও। আর আমার বউ এগারোতম বাচ্চা হওয়াতে অসুস্থ হয়ে আছে, তাকে সুস্থ করে দাও।'

পাশে বসা জমিরুদ্দি দোয়া করলো, 'হে আল্লাহ তুমি তো সব জানো, আমি গতরাতে ইউসুফের পুকুরে বিষ দিয়ে মাছগুলো মেরে ফেলেছি, ওরা খুব খোঁজ তালাস করতেছে, মামলাও নাকি করবে। আমাকে যেন সন্দেহ না করে বা বুঝতে না পারে সে ব্যবস্থা করে দাও। আর আমার ছেলেটা

পড়ায় মনোযোগী না, ওরে পড়ায় মনোযোগী করে দাও।' দূরে বসা ইউসুফ দোয়া করলো, 'হে আল্লাহ, তুমি তো দেখেছো কত কষ্ট করে আমি মাছ চাষ করেছি। মাছগুলো বড় হতে না হতেই বিষ দিয়ে দিল। কে দিলো কেন দিলো, তারে যেন ধরতে পারি। তার বিচার তুমি করিও।'

কোণে বসা এক নেতা করিম দোয়া করলো, 'আগামী নির্বাচনে যেন পার্টির ইউনিয়ন শাখার সভাপতি হতে পারি সেই তৌফিক এনায়েত করে দাও।' আল্লাহর কাছে কেঁদে কেঁদে অনুরোধ করলো।

পেছনের সারিতে বসা এক ছাত্র মনির দোয়া করলো, 'হে আল্লাহ পরীক্ষায় যেন প্রথম হতে পারি, কলিমুদ্দির ছেলে কফিল যেন কোনোভাবেই প্রথম না হয়।' পাশেই কলিমুদ্দির ছেলে কফিল বসা। সেও দোয়া করলো ক্লাসে প্রথম হওয়ার জন্য।

মাঝখানে বসা কলেজে পড়া তরুণ ফরিদ দোয়া করলো, 'আল্লাহ তুমি তো জানো আমি কতটা ভালোবাসি ফারজানাকে। ফারজানার মন তুমি নরম করে দাও। তার চোখে তুমি আমারে এত যোগ্য করে দাও, যেন সে আমারে ছাড়া আর কারও দিকে না তাকায়।' পাশেই বসা ফজলুও দোয়া করলো, 'হে প্রভু, ফারজানা যেন কোনোভাবেই ফরিদকে পছন্দ না করে। আমার সাথে যেন জোড়া লাগে, আমার সাথে ফারজানার লাইনটা তুমি ক্লিয়ার করে দাও। তুমিতো খোদা সবই পারো।'

সামনে বসা বৃদ্ধ বসিরুদ্দি দোয়া করলেন, 'হে আল্লাহ, অনেকদিন ধরে ক্যান্সারে ভুগতেছি, তুমি আমারে কূল করে নাও। হয় নিয়ে যাও, না হয় সুস্থ করে দাও। সন্তানদের ও সন্তানদের বউদের কথার অত্যাচার আর নিতে পারতেছি না। যাদের কষ্ট করে বড় করলাম, তারাই আজ আমাকে দুটি ভাত দেয় আর সামান্য চিকিৎসা করে। তাতে কথায় কথায় খোটা দেয়। এসব কথার খোঁচা ও খোটা নেওয়ার চাইতে মরে যাওয়া ভালো। বিষ খেয়ে মরে যেতাম। কিন্তু আত্মহত্যা মহাপাপ। তাই সে পথে যাইনি। তুমি তো যখন তখন মানুষকে মৃত্যু দিতে পারো। আমাকেও নিয়ে যাও।'

বাঁ দিকে পেছনে বসা রমিজ দোয়া করলো 'হে আল্লাহ, তুমি দেখেছো আমি বছরের পর বছর প্রবাসে দিন কাটিয়েছি। আয় করে বাড়িতে পাঠিয়েছি। এখন দেশে এসে শুনি আমার সব টাকা বউ কাজে লাগায় নি। কোথায় কত আছে কোনো হিসাব পাচ্ছি না। আবার লোকজন বলতেছে, ওর সাথে নাকি

পাশের বাড়ির কার গোপন সম্পর্ক আছে। এসব অনাচার থেকে আমাকে উদ্ধার করো। আমার বউকে আমার দিকে রুজু করে দাও। আমার সংসারে শান্তি এনে দাও। আর আমি যে আফ্রিকা থাকার সময় মিশরি মেয়ের সাথে লিভ টুগেদার করেছি, এ খবর যেন কেউ না জানে। তুমি সকল কিছু গোপন করে দাও।'

পেছনের এক কোনায় বসা মতিন দোয়া করে 'হে প্রভু, তুমি তো জানো আমি কত কষ্ট করে ছোট ভাইকে পড়াশোনা করিয়েছি। তাকে কোনো কাজ করতে দেইনি। বড় অ্যাডভোকেট বানিয়েছি। আমি নিজে বিয়ে করিনি। তিলে তিলে টাকা জমিয়ে ৫০ কানি জমি কিনেছি। যে ভাইকে এত কষ্ট করে বড় করলাম, সে ভাই এখন অ্যাডভোকেট হয়ে গ্রামের সমস্ত জমি একা ভোগ করতে চায়। আমাকে আমার জমির ভাগ দিতে চায় না। তুমি তাকে হেদায়েত করো। তোমার কাছে বিচার দিলাম।' পাশেই বসা তার ভাই লুকমান দোয়া করে, 'আল্লাহ গো, তুমি তো জানো আমি বাপের সম্পদ প্রাপ্য। আমার ছোটবেলায় পড়াশোনা করিয়েছে, এটা তাদের দায়িত্ব। এখন এসব বলে আমাকে আমার সম্পদ বেচতে দেয় না। তুমি এটার একটা বিহিত করবা। তুমি সকল ক্ষমতার মালিক।'

ইমাম সাহেব সময় দিয়েছে মাত্র এক মিনিট। এরই মাঝে সবাই যার যার দোয়ার চাহিদা খুলে বসেছে। কল্পনায় তুলে ধরেছে খোদার কাছে বিড়বিড় করে। এ এক আজব জায়গা। যেখানে এসে প্রতিটি মানুষ সব সত্য কথা বলে। নিজের দোষ, সমস্যা কিছুই লুকাতে পারে না। সব খুলে বলে আল্লাহর কাছে। আল্লাহর কাছে কিছু লুকায় না। মানুষ আল্লার কাছে সব বলে কেন? কারণ আল্লাহ পাক সব গোপন রাখেন। প্রকাশ হবার সম্ভাবনা নেই। যেহেতু প্রকাশ হওয়ার সম্ভাবনা নেই তাই আল্লাহর কাছে সব বলে। তাছাড়া আল্লাহ পাক সব নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা রাখেন—এটাও মানুষের বিশ্বাস। সেই বিশ্বাসকে কেন্দ্র করেই মানুষ আল্লাহর কাছে সব গোপন আর্জির ঝাঁপি খুলে বসে।

সবার সব দোয়া নিয়ে ফেরেশতারা আল্লাহর কাছে যায়। সাত আসমান পেরিয়ে সিদরাতুল মুনতাহা পেরিয়ে আল্লাহ পাকের কাছে পৌঁছায়। আল্লাহ পাক তো সর্বত্রই বিরাজমান। তবে ফেরেশতাদের কেন কষ্ট করে এত ওপরে আসতে হলো? ফেরেশতাদের আসলে কষ্ট হয় না। টুশ করে যখন তখন যেখানে সেখানে চলে যেতে পারে। ফেরেশতারা গিয়ে আল্লাহ পাককে কী অবস্থায়

পেলো? আল্লাহ পাক ঘুমান না। কিংবা ঘুম বা জেগে থাকা ইত্যাকার মানবীয় বিষয় আল্লাহ পাকের নয়। ফেরেশতারা দোয়ার লিস্ট নিয়ে আল্লাহ পাককে দেয়। আল্লাহ পাক যদিও আগেই জানেন বা সব শুনেছেন, দেখেছেন। তবু লিস্ট উল্টে পাল্টে দেখেন। কিংবা মানুষের কাঁধে বসা কেরামান কাতিবিনের খাতার সাথে মিলিয়ে নেন। আল্লাহ পাক হয়তো সব দোয়ার লিস্ট দেখে মুচকি হাসেন। আর বলেন, মানুষ আমার সেরা সৃষ্টি। মানুষই যদি এরকম হয়, তবে বাকিরা কীরকম! ফেরেশতারা জিজ্ঞেস করে, সবার দোয়া কোনটি কবুল করবেন, আর কোনটি কোনটি করবেন না? ফেরেশতাদের প্রশ্নে হয়তো আল্লাহ পাক কৌতুক বোধ করেন।

কারণ দোয়ার মধ্যেই যে প্যাঁচ লাগানো তা কবুল করতে গেলে ঝামেলা বেঁধে যাবে। একজনের দোয়া কবুল করতে গেলে আরেকজনকে বঞ্চিত করতে হয়। মামলায় একজন জিতলে আরেকজন হারবে, ফারজানাকে একজন পেলে আরেকজন পাবে না, ইলেকশনে একজন জিতলে আরেকজন হারবে। তাই তাদের সবার দোয়া কবুল করা বা বাতিল করা কোনোটাই সম্ভব না। আল্লাহপাক এসব ছোট বিষয়ে নজর না দেওয়ার ভাব করে ধ্যানে থাকলেন। আর ফেরেশতারা গায়েবি আওয়াজ শুনতে পেলেন। 'লেট ইট বি। যা হওয়ার তাই হোক। প্রত্যেকে যার যার চেষ্টা ও কর্ম করুক। যার চেষ্টা ও কর্ম শতভাগ হবে, সে ততটুকু সফল হবে। মানুষকে আমি বিদ্যা, বুদ্ধি, শারিরীক-মানসিক ক্ষমতা দিয়ে দিয়েছি। মেসেঞ্জার পাঠিয়ে ভালো মন্দ পথ কী তা জানিয়েছি। এখন মানুষ যা করবে তার ফল পাবে। দুনিয়াতেও পাবে আখেরাতেও পাবে। এ কারণেই রাখা হয়েছে পরকাল, বেহেশত-দোজখ। সুতরাং মানুষ নিজেরা করুক। নিজেরা চেষ্টা করুক। নিজেরা করলে নিজেদের কাজের হিসেব নিজেরা দিবে।'

হুজুর দোয়া করার সময় প্রতিবারই বলে যে, 'চাওয়ার মতো চাইলে দোয়া কবুল হয়। সেরকমভাবে খালেস নিয়তে চাইতে হবে। চাওয়ার মধ্যে গলদ থাকলে বা বিশ্বাসে কমতি থাকলে পাওয়া যাবে না। আল্লাহর কাছ থেকে কেউ নিরাশ হয় না।'

মুসল্লিদের মধ্য থেকে রহমান একদিন হুজুরকে প্রশ্ন করে, 'হুজুর, আমি তো মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি, আল্লাহপাকের ক্ষমতা সব। দোয়াও করি খালেস নিয়তে। তবু আমার দোয়া কবুল হয় না কেন?'

হুজুর বলেন, 'মনে প্রাণে চাইলে তো কবুল হওয়ার কথা। কী চেয়েছিলেন আর কী পাননি জানলে উত্তর দেওয়া সহজ হতো। শুনে রহমান কাচুমাচু করে। কথা বলে না। হুজুর ব্যখ্যা দেয়, 'মনে প্রাণে চাওয়ার অর্থ হলো যা চাইলেন তার জন্য আপনাকে কাজ করতে হবে। মনে প্রাণে চেষ্টা করতে হবে। আপনি অর্থ রুজি করতে চান। সেক্ষেত্রে সেরকমভাবে পরিকল্পনা করতে হবে, আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে, বুদ্ধি খাটাতে হবে, পরিশ্রম করতে হবে। কেবল আল্লাহর কাছে চাইলেন তাহলে হবে না। নিজেও কাজ করতে হবে। শুনে রহমান বলে, 'যদি আমারই সব করা লাগে তবে আল্লাহ পাকের কাজ কী?' হুজুর হেসে পুনরায় বলে, 'আল্লাহ পাকের কাজ রহমত নাজিল করা, বরকত দেয়া। যা কিছু কল্যাণকর তা তোমার জন্য বরাদ্দ করা। যা কিছু অকল্যাণকর তা না দেয়া। বিশেষ করে মানুষ জানে না যে কোনটা তার জন্য মঙ্গলজনক। ধরো একজন মানুষ চাইলো যে, সে ইউরোপে যাবে চাকরি করতে। কিন্তু অনেক পরিশ্রম ও চেষ্টা করার পরেও তার এ দোয়া বা চেষ্টা কবুল হলো না। ইতালি যাওয়া হলো না। লোকটি চেষ্টাও করেছে, খোদার নিকট দোয়াও করেছে। দোয়া কবুল হয়েছে বটে। কিন্তু ইতালি যাওয়া হলো না। তখন লোকটি মন খারাপ করে বটে। ভাবে মনে হয় আল্লাহ তার দোয়া কবুল করেননি। বস্তুত লোকটি যদি জানতো যে ইতালি যাওয়ার পরে যে কারখানায় কাজ করতো সে কারখানার অগ্নিকাণ্ডে লোকটির পা হারাতো। তাহলে কি লোকটি ইতালি যেতে চাইতো? চাইতো না। যদি কোনো ইচ্ছা পূরণ না হয় তবে বুঝতে হবে যে, নিশ্চয়ই এর মধ্যে মঙ্গল রয়েছে। ইতালি না যাওয়ার মধ্যেও মঙ্গল নিহিত থাকতে পারে। লোকটি মূলত কী চেয়েছিল? আরাম ও শান্তির জীবন, অর্থ ও স্বচ্ছলতার জীবন। সেটা দেশে থেকেও হতে পারে যা আল্লাহপাক নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

এ প্রসঙ্গে ভারতবর্ষে প্রচলিত একটি গলপ বললেন ইমাম সাহেব। ইসরায়েলের সম্রাট সুলাইমান তথা বাদশা সুলাইমান একবার নিজ দপ্তরে বসে এক মন্ত্রীর সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন। এমন সময় সুন্দর চেহারা ও দামি পোশাক পরিহিত এক ব্যক্তি সুলাইমানের কক্ষে প্রবেশ করলেন এবং কিছুক্ষণ বসার পর চলে গেলেন। লোকটি চলে যাওয়ার পর মন্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন, 'হে বাদশা, এই মাত্র আপনার কাছে যে লোকটি এসেছিলেন তিনি কে?' সুলাইমান বললেন, 'তিনি মৃত্যুর ফেরেশতা মালেকুল মউত।'

এই কথা শুনে মন্ত্রী কাঁপতে লাগলেন এবং তার চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। বাতাস ছিল সম্রাট সুলাইমানের আজ্ঞাবহ। মন্ত্রী বললেন, 'হে বাদশা, অনুগ্রহ করে আপনার আজ্ঞাবহ বাতাসকে হুকুম দিন, সে যেন আমাকে হিন্দুস্তান পৌঁছে দেয়। কারণ যেখানে মৃত্যুর ফেরেশতা বসেছে, সেখানে বসে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব।' সম্রাট সুলাইমান মন্ত্রীর আবেদন গ্রহণ করলেন এবং তাকে হিন্দুস্তান পৌঁছে দেওয়ার জন্য বাতাসকে নির্দেশ দিলেন। বাতাস মন্ত্রীকে হিন্দুস্তান পৌঁছে দিল।

কিছুক্ষণ পর আবার মালেকুল মউত উপস্থিত হলেন সুলাইমানের দপ্তরে। জানতে চাইলেন, 'মাননীয় সম্রাট, আপনার মন্ত্রী কোথায়?' সম্রাট বললেন, 'আপনার ভয়ের কারণে বাতাস তাকে হিন্দুস্তান পৌঁছে দিয়েছে।' মালেকুল মউত বললেন, 'কিছুক্ষণ আগে যখন আমি আপনার দপ্তরে এসেছিলাম, তখন ওই মন্ত্রীকে দেখে আশ্চর্য হয়েছিলাম। কেননা আমার প্রতি নির্দেশ ছিল হিন্দুস্তান থেকে তার জান কবজ করার। কিন্তু সেই ব্যক্তি হাজার মাইল দূরে আপনার কাছে বসে আছে দেখে অবাক হয়েছিলাম। আমি নির্দিষ্ট সময়ে হিন্দুস্তান পৌঁছে দেখি আপনার মন্ত্রী হিন্দুস্তানে উপস্থিত এবং তার জান কবজ করে আবার আপনার কাছে এলাম।'

গল্পটির মোরাল হলো মন্ত্রীর কর্মগুণে বা কপালগুণে যেখানে মরবার সেখানেই মরবে। সোলায়মানকে দোষ দেয়ার কিছু নেই। অতি সম্প্রতি চিশতি বয়াতির গানটিও স্মর্তব্য। 'যদি থাকে নসিবে আপনি আপনি আসিবে জোর করে মন হরণ করো না।'

আনচান

মুনার বয়স ত্রিশ পেরিয়ে চল্লিশের দিকে ধাবিত। একটি সরকারি কলেজের প্রভাষক। একটি গভর্ণমেন্ট ট্যুরে সিঙ্গাপুরে এসছে। ইদানিং সরকারি কর্মকর্তাদের পোয়াবারো। কথায় কথায় বিদেশ প্রশিক্ষণে যায়। প্রশিক্ষণ নাম মাত্র। ভ্রমণ, শপিং, ঘোরাঘুরিই মূল। প্রশিক্ষণ ওছিলামাত্র। সুন্দর নাম আছে এর। উন্নত দেশের এক্সপোজার। তা অবশ্য হয়। বাইরের এক্সপোজার হলে কিছু পরিবর্তন তো হয়ই। যদিও কিছু কিছু প্রশিক্ষণ আসলেই হাস্যকর। যেমন খিচুড়ি রান্না শিখতে ভারতভ্রমণ। যাক মুনা অবশ্য এরকম নামমাত্র প্রশিক্ষণে আসেনি। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার মান বৃদ্ধি ও টেকসই উন্নয়ন নিয়ে সিঙ্গাপুরের অভিজ্ঞতা নিতেই এসছে। সিংগাপুর এ বিষয়ে অভিজ্ঞ কিনা এ নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। তবে সিঙ্গাপুর ইউনিভার্সিটির নামকরা প্রফেসরগণ এ কোর্সের আয়োজক। সুতরাং তাদের নিশ্চয়ই বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট, সফল উদাহরণ, বাস্তব অনুশীলন নিয়ে জ্ঞানভাণ্ডার আছে। না থাকলে বিতরণ করতে যাবে কেন?'

সেই প্রশিক্ষণেরই উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হচ্ছে হোটেলের কনফারেন্স কক্ষে। প্রোগ্রামে এসে মুনা বুঝতে পারে যে এখানে একই ইউনিভার্সিটির দুটো কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হতে যাচ্ছে। কারণ দুটো দলই বাংলাদেশ থেকে আগত। অন্য দলটি গভর্নেন্স ইস্যুতে প্রশিক্ষণ নেবে। আর মুনার দল শিক্ষার উন্নয়ন। মুনা তার টিমের দলনেতা। অন্যদলে অন্যজন দলনেতা। প্রতিটি দলেই পনেরো জনের অধিক অফিসার। স্বাগত বক্তব্য দিয়ে কোর্স পরিচালক অনুষ্ঠান শুরু করলেন। এরপরই দলনেতা হিসেবে মুনার পুরো নাম ঘোষণা করা হয়। নামটি ঘোষণার সাথে সাথে বাঁ পাশের বেঞ্চের একজনের

চোখ তার ওপর নিবদ্ধ হয়ে যায়। এত দ্রুত লোকটি ঘাড় ঘুরিয়ে তার দিকে তাকায় যে মুনাও অবাক হয়ে যায়। লোকটির নাম জহির। জহিরের চোখে মুখে প্রশ্ন দেখা যাচ্ছে মুনা এখানে কীভাবে কেন? আর মুনার মনেও প্রশ্ন জহির সাহেব এখানে কেন? মুনার বুক ধড়ফর করা শুরু হয়। কিন্তু কিছু করার নেই। মঞ্চে ডাক পড়ে গেছে। সুতরাং তাকে যেতে হবে মঞ্চে। মঞ্চে গিয়ে স্বভাবসুলভ স্বাভাবিকতায় সে বক্তৃতা শুরু করে। মাঝে মাঝেই লোকটির দিকে চোখ যায়। কিন্তু লোকটি তার দিকে আর তাকায় না। সেটা খেয়াল করে মুনা। বক্তৃতা স্মার্টলি চালিয়ে যায়। বক্তব্য শেষে মুনা নিজ আসনে বসে। মোবাইল হাতে নিয়ে ফেসবুকে যায়। ইনবক্সে নক করে জহিরকে।

: আসসালামু আলাইকুম।

: ওয়ালাইকুম সালাম।

: কেমন আছেন?

: ভালো। আপনি কেমন আছেন?

ফরমাল রিপ্লাই দেখে মুনার আর কথা বাড়ানোর ইচ্ছা হয় না।

দুজনেই ক্লাসে মন দেয়। ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে জহির মাঝে মাঝে দেখে ঘার কাত করে মুনা কী করে। মুনাও নির্দিষ্ট সময় পরপর জহিরের গতিবিধি লক্ষ্য করে। চোখে চোখ পড়ে। আবার ফিরিয়েও নেয়। হাসি বিনিময় হয়। তবে সেই হাসি ফরমাল নাকি নরমাল তা ঠাহর করা যায় না।

জহির মন দিয়ে কী যেন টাইপ করে ল্যাপটপে। মুনা পরে ইনবক্সে নক করে।

: কী এত লিখেন ল্যাপটপে?

: গল্প লেখি।

: কী গল্প? কী নিয়ে?

জীবনের গল্প। জেতার গল্প, হারার গল্প। কিংবা যারা হারেও না জেতেও না তাদের হিজরা টাইপ গল্প।

: ক্লাসে বসে গল্প লিখতে হবে কেন? ক্লাসে মন দেন।

: ক্লাসের নোটও নিচ্ছি। গল্পও লিখছি। আবার আপনাকেও দেখছি। আপনার সাথে আমার যা হচ্ছে এখন তাও লিখছি।

: কী হচ্ছে?

: কী হচ্ছে তা প্রশ্ন না করে চোখ বন্ধ করে ভাবুন কী কী হচ্ছে। আমাকে

দেখে কি মন বিষণ্ন হলো? নাকি উদ্বেলিত হলো? সে প্রশ্নগুলোও নিজেকে করেন।

: কী জানি। আমার কিছু হচ্ছে না।

: তাহলে তো ভালোই। যদি কিছুই না হবে। তবে আমাকে প্রশ্ন করেন কেন? আমি কী লেখি ল্যাপটপে তা জানার জন্য আপনার মন আকুপাকু করে কেন? আমরা স্বীকার করি বা না করি, আমাদের মনে কে কখন কী রেখাপাত করে যায় তার কোনো ঠিক নেই।

: আপনি বেশি কথা কন।

: ওকে কথার ইস্তফা দিলাম।

দুজনে আবার ক্লাসে মজে। ক্লাসের আলোচনায় অংশও নেয়। জহির প্রশ্ন করে উত্তর পায়। ক্লাস প্রায় শেষ। ছুটি হবে। শিডিউল টাইম পেরিয়ে গেছে। মুনা উঠে দাঁড়ায় প্রশ্ন করতে। লেডি দাঁড়িয়েছে দেখে লেকচারার আগ্রহ পায়। সুন্দরীদের প্রশ্নের উত্তর দিবে না এমন পুরুষ পৃথিবীতে বিরল। দেশি পুরুষ হোক আর বিদেশি হোক। মুনার প্রশ্ন একটি নয়, কয়েকটি। এদিকে ক্লাসের সবাই চরম বিরক্ত। ক্লাস শেষে সবাই যাবে ঘুরতে। কেনাকাটা করতে। প্রতি মিনিট সময় গুরুত্বপূর্ণ। আর মুনা কিনা ক্লাস টাইমের পরে কয়েকটা প্রশ্ন করে বসেছে। লেকচারার প্রতিটি প্রশ্নের লম্বা উত্তর দিতে লাগলো। আর ক্লাসের সবাই রাগে ফুঁসছে। প্রতিটি ট্রেনিংয়ে এরকম কিছু আঁতেল থাকে। ক্লাস শেষে এদের জানার আগ্রহ বেড়ে যায়। দুনিয়ার জ্ঞান নিতে আসে। কিন্তু কিছু বলতে পারছে না। সুন্দরীদেরকে পুরুষরা রাগ দেখাতে পারে না। তবে নিজেরা নিজেরা রাগে গজগজ করতেছে। এরই মাঝে মুনা ইনবক্সে নক করেছে।

: ক্লাসশেষে কোথায় যাবেন?

: যেদিকে দুচোখ যায়।

: খেয়ালি বাদ দিন। সিরিয়াস প্রশ্ন। উত্তর দিন।

: আমার কত সিরিয়াস কথা কতজনে দিনের পর দিন উড়িয়ে দিয়েছে। আমি কেন সিরিয়াস হবো?

: ঠিক আছে সিরিয়াস হওয়ার দরকার নেই। ক্লাস শেষে যেখানেই যান, আমাকে নিয়ে যাবেন।

: আমি নিয়ে যাবো মানে কি? আমি কি ক্যারিয়ার? যার যার পায়ে সে হাঁটবে। যার যার ভেহিক্যালে সে ঘুরবে।

: আমি একা যাবো না। আপনার ট্যাক্সিতে আমাকে নিয়ে যাবেন।

: আমি ক্লাস থেকে এক্ষুণি বের হবো।

: আমি রুমে গিয়ে ব্যাগ রেখে আসবো। লবিতে একটু দাঁড়াবেন। বাই।

মুনা বাই বলে রুমে চলে গেলো। জহির ক্লাস থেকে বের হয়ে লবিতে এলো। লবি থেকে বের হয়ে ট্যাক্সি ডাকতে গিয়ে ডাকতে পারলো না। অদৃশ্য এক টান তাকে আটকে রাখলো। মুনা আসলো দশ মিনিট পরে। এসেই বিশ্বজয় করা হাসি দিয়ে বললো, 'কই যেতে পারলেন না আমাকে ফেলে?' জহির বিব্রত হয়ে চোখে মুখে হাসি ছড়িয়ে বের হয়ে গেলো। ট্যাক্সি ডাকলো। দুজনে ট্যাক্সিতে বসে আছে।

দুজনেই দুদিকের জানালাতে তাকিয়ে আছে। দেখছে সিঙ্গাপুর সিটির দৃশ্য। গাড়ি হাওয়ার বেগে চলছে। ভবন আর বৃক্ষরাজি পেছনে দৌড়াচ্ছে। পাশাপাশি বসা দুজন। তবে কথা নেই কারও মুখে। মুখে কথা না থাকলেও মনে মনে কথার খৈ ফুটছে। মুনা ভাবছে যে, এভাবে একসাথে ট্যাক্সিতে ওঠা ঠিক হলো কিনা। দেশের কেউ যদি দেখে ফেলে তারা কী ভাববে! কী আর ভাববে? বিদেশের বাড়িতে দুজনে একসাথে ট্যাক্সি শেয়ার করতেই পারে। এটা সাধারণ একটা বিষয়। তবু মুনার বুক কাঁপছে। তবে কি মুনা নিজের ভেতরে কোনোকিছু কাজ করছে? চোরের মন পুলিশ পুলিশ দশা। জহির সাহেবের প্রতি তার যদি কোনো অন্যরকম ফিলিংস না-ই থাকবে, তবে এরকম আড়ষ্ট হবার কারণ কী? তাছাড়া জহির সাহেব কী ভাববে? তার সাথে যেচে এরকম ট্যাক্সিতে ঘুরতে যাওয়া, বা নগরীর পর্যটন প্লেসগুলো ঘুরতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত কি ঠিক হলো?ইত্যাকার প্রশ্ন মুনার মনে ঘুরপাক খেতে থাকে।

মুনার মনে পড়ে আজ থেকে প্রায় দশ বছর আগের কথা। একটি জেলা শহরে কাজ করতো মুনা। তখন কী করে যেন শক্ত ধাতের মুনার সাথে তারই এক কলিগের সাথে ইয়ে হয়ে যায়। মুনা সরকারি কলেজের প্রভাষক। প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা আর কলিগ কৃষি বিভাগের দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তা আবীর। মুনা ইউনিভার্সিটি কলেজ পেরিয়ে চাকুরিতে চলে এসেছে। কখনো কারও সাথে এরকম কিছু ঘটার মতো হয়নি। মুনা সেসবে মন দেয় নি। কিন্তু কী এক কারণে কথা বলতে বলতে কৃষি বিভাগের আবীরের সাথে মুনার ভাব হয়ে যায়। সেসব কথা আশপাশের অনেক অফিসারদের মধ্যে জানিজানি হয়ে যায়। এবং জেলা সদরের অফিসারদের চায়ের আড্ডায় এ প্রসঙ্গ খুব মজা

করেই আলোচিত হয়। এরই মধ্যে তাদের বিয়ে হয়ে যায়।

বিয়ের পরে কয়েকদিন ভালোই চলে। এর পরেই আবীরের রূপ পাল্টে যায়। পদে জুনিয়র বলে হীনমণ্যতায় ভুগতে থাকে আবীর। আর মিশুক প্রকৃতির সুন্দরী মুনা সবার সাথে সামাজিকতা রক্ষা করে হেসে হেসে কথা বলে বিধায় সন্দেহবাতিকগ্রস্ততায় ধরে তাকে। কথাবার্তার উচ্চবাচ্য ছাড়াও মারধরের ঘটনাও ঘটতে থাকে। একদিন, দুদিন, তিনদিন। মুনার আর সহ্য হয় না। মাসের পর মাস নির্যাতন চলতে থাকে। যেহেতু নিজের পছন্দে বিয়ে করেছে সেহেতু কাউকে বলতেও পারছে না। বাবা মা বারণ করেছিল। বাবা মার অমতে কর্মস্থলেই কলিগদের নিয়ে বিয়ের প্রোগ্রাম হয় তখন। সুতরাং কিছু করার নেই। দিনের পর দিন সহ্য করতে থাকে। আবীরেরও হীনমণ্যতা, ও সন্দেহ বাড়তে থাকে। মারধরও বাড়তে থাকে। এক পর্যায়ে যখন প্রাণ ওষ্ঠাগত অবস্থা তখন বিচ্ছেদের পথ বেছে নেয় মুনা। এ সময়টা একা একা জেলাতে কাটানো ও অফিসে সাধারণ জীবন যাপন করা কঠিনই ছিল। এর মধ্যে বাবা-মার সাথে গিয়ে থেকে দেখেছে। বাবা মা বিচ্ছেদের বিষয়টা মেনে নিলেও পুনরায় বিয়ে করার জন্য চাপ দিতে থাকে। আছে আত্মীয়স্বজনদের নানান টিপ্পনী। কিন্তু আবীরের সাথে তার কী কী ঘটনা ঘটেছে, এখন সত্যিকার অর্থে কীরকম মানসিক অবস্থার ভেতর দিয়ে যাচ্ছে তা বলার মতো কেউ নেই। না ভাই, না বাবা মা, না কোনো বন্ধু বান্ধব, না জেলার কলিগরা। কারণ জেলার কলিগরাও তখন দুভাগে বিভক্ত। কেউ মুনার পক্ষ নেয়, কেউ আবীরের পক্ষ নেয়। এবং তাদের নিয়ে গীবত অপবাদ আর বানানো কাহিনির ডালপালা ছড়াতে থাকে। মুনার কাছে পৃথিবী বিষময় লাগে। মুনা তখন ওই জেলা থেকে বদলি হওয়ার প্রয়োজন অনুভব করে।

বদলির জন্য কাকে বলা যায় কাকে বলা যায় ভাবতে ভাবতে তখন মুনার মাথায় একজনের নাম আসে। সেই লোকটিই এই জহির সাহেব। মুনা যখন ওই জেলায় প্রথম যোগদান করে তখন জহির সাহেব একটি সিনিয়র পদে ছিলেন। মিশুক প্রকৃতির এ কর্মকর্তা জুনিয়রদের খেয়াল রাখতেন, উৎসাহ দিতেন এবং পারিবারিক আবহে সকলের সাথে কাজ করতেন। মুনার সাথে প্রথম যেদিন দেখা হয়েছিল সেদিনটি ভুলতে পারেনি মুনা। সব মিলিয়ে ভালো লেগেছিল। জহির সাহেব বছরখানেকের মধ্যেই বদলি হয়ে যায়। আর কথা বার্তা হয়নি। ফেসবুকে নিউজফিডে দেখা যায়। যেহেতু সবার প্রতি আন্তরিক

ছিল সেই ভরসাতেই বদলি সংক্রান্ত বিষয়ে কাকে বলা যায়—ভাবনাতে জহির সাহেবের নাম মুনার মনে আসে। মুনা ইনবক্সে নক করে। সালাম ও কুশল বিনিময়ের পরে বদলির বিষয়টি তুলে মুনা। এ বিষয়ে হেল্প করবে, সংশ্লিষ্ট সবাইকে বলে দেবে—জানায় জহির সাহেব। কিন্তু বদলি চায় কেন—এ প্রশ্নের উত্তরে এ কথা সে কথা অনেক কথাই বলে যায় মুনা। কথা বলতে বলতেই বুকের চাপা বাঁধ ভেঙে যায় মুনার। সব ঘটনা খুলে বলে জহির সাহেবকে। বলে আর কাঁদে। জহির সাহেবও মনোযোগী শ্রোতা হিসেবে সব শোনে। অনেক দিন পরে মুনা বুকে হালকা অনুভব করে। যে কথা কাউকে বলতে পারছিল না। সে কথাগুলো একজনকে বলতে পারলো। মুনা এটুকু বুঝতে পেরেছে—এই লোকের দ্বারা তার কোনো ক্ষতি হবে না। তাই মাঝে মাঝেই কথা হয়। এর মধ্যে বদলিটিও হয়ে যায়। জহির সাহেবের তদবির আর অন্য তদবির মিলে।

বদলি হয়ে গেলেও মুনা জহির সাহেবের সাথে কথা চালিয়ে যায়। সারাদিন অফিস রাতে বাসায় বাবা মার সাথে কথা বলা। আছে বন্ধু বান্ধব। তবু একজনের সাথেই তার কথা সব বলতে পারে। যার সাথে কথা বলে মন হালকা হয়। প্রতিটি মানুষেরই এরকম একজন লোক দরকার যাকে সব কথা বলা যায়। এমনকি গোপন কথাও। তাহলে মনের ওপর চাপ কমে।

এসব ভাবতে ভাবতেই ট্যাক্সি এসে নদীর ধারে থামে। শহরের মাঝখানে নদী আর দুপাশে ভবন আর রেস্তোরাঁর মেলা। প্রতিটি ভবন ও রেস্তোরাঁর আলোকসজ্জা গিয়ে নদীর পানিতে বিচ্ছুরণ ঘটায়। নদীর পাশেই একটা রেস্তোরাঁর বসে দুজন।

বসে দুজন দুজনের দিকে তাকিয়ে থাকে। এবং পরক্ষণেই দুজনে হেসে উঠে। কেন তাকালো, কেন হেসে উঠলো—তার কোনো জবাব দুজনে জানে না। জহির সাহেব মুখ খুললো—

: কী খাবেন বলেন?

: কিছু না।

: কিছু না খেয়ে তো আর থাকা যাবে না।

: দেন, কিছু একটা অর্ডার দেন। যা আপনার মনে চায়।

: বিদেশের তিনটা জিনিসই আমার ভালো লাগে। জুস, সি ফিশ আর কফি। সি ফিশ আর কফি অর্ডার দিব?

মুনা মাথা নেড়ে সায় দিল।

ওয়েটারকে অর্ডার দিয়ে দিলো জহির সাহেব। আবারও দুজনে চুপচাপ। নদীর পানি দেখছে, পানির ভেতরে নগরীর আলোকসজ্জার খেলা দেখছে, আকাশে চাঁদও রয়েছে। চোখে-মুখে বাতাস এসে লাগছে। একটা স্বর্গীয় অনুভূতি কাজ করছে। উভয়েই অনুভব করছে নিজেদের নীরবতার জগত।

মুনার মনে পড়ে যায়। বদলি হওয়ার পরও জহির সাহেবের সাথে তার কথা বন্ধ হয় না। বরং রুটিনে পরিণত হয়েছে। কথা না বলতে পারলে মুনা অস্থির হয়ে ওঠে। আর জহির সাহেবও নিয়মিত ফোন দেয়। কেবল ফোন দেয় তা নয়, সাথে এমন কিছু কথাবার্তা বলে যেগুলো রোমাঞ্চকর। হালকা টোনে বিভিন্ন বাক্য বলে বলে নিজের অনুভূতি প্রকাশ করে। রাগও করা যায় না আবার হজমও করা যায় না। মুনার রাগ লাগে। আবার ভালোও লাগে। আকারে ইঙ্গিতে জহির সাহেব নানান কথা বলতে চায়। যা বলতে চায় তা সত্য কিনা, তা সতিকার অর্থেই জহির সাহেবের মনের অনুভূতি কিনা তা মুনা ঠাহর করতে পারে না। তবে ভালো লাগে কথা বলতে। তাই কথা বলে যায়। মুনা নিয়মিত ফোন দেয়। মুনা মিস করলে জহির সাহেব ফোন করে। এমন কোনো সপ্তাহ নেই যে আলাপ হয় না। সেই আলাপ দেশ, চাকরি, কর্মস্থল, পুরাতন কর্মস্থল, রাজনীতি, কবিতা, দর্শন সব উঠে আসে। সাথে উঠে আসে নিজেদের আবেগ অনুরাগের মূর্ছনা। মুনা নির্ভর করতে চায়, আবার ভয় পায়। এক পা আগায় আবার আরেক পা পেছায়।

মুনা বুঝতে পারে যে, এখানে আগানোর কিছু নেই। কারণ জহির সাহেব তিন ছেলে এক মেয়ে ও স্ত্রী নিয়ে সুখের সংসার করছে। সংসারের সব বিষয়ে তিনি পূর্ণ সুখী মানুষ বলেই সবসময় প্রকাশ করে থাকেন। সুতরাং সিরিয়াস কোনো বিষয় হয়তো নয়। তবু যখন জহির সাহেবের সাথে কথা বলেন তখন তার কেমন যেন হাঁসফাঁস লাগে। মনে হয় এক্ষুণি উড়ে চলে যাবে, আবার মনে হয় ভুলেও একাজ করা যাবে না। এরকম কথা বলতে বলতে দুজনের মধ্যে একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠে। যে সম্পর্কের নাম দেওয়া যাবে না। পবিত্র সম্পর্ক বলা যেতে পারে। আবার ধর্ম ও সামাজিক রীতির ছাঁচে ফেললে অপবিত্র ও অনৈতিক সম্পর্কও বলা যেতে পারে। দূরে থেকে ফোনের আলাপের মধ্যেই যে সম্পর্ক নিহীত সে সম্পর্ককে কোনো নাম দেওয়া কঠিন। তবু তা চলতে থাকে।

ওয়েটার খাবার নিয়ে আসে। জহির সাহেবের সি ফিশ পছন্দ। খুব আয়েশ করে খাওয়া শুরু করে। কাটা চামচ দিয়ে খুটে খুটে ফিশ ফ্রাই খেয়ে যান। ফিশ ফ্রাই কাটা চামচে লাগিয়ে সসের মধ্যে একটু ডুবিয়ে মুখে চালান করে দেওয়ার পরে চোখ বন্ধু করে রাখে কিছুক্ষণ। অমৃত স্বাদটিকে প্রেমিকার চুমুর চেয়ে কম স্বাদের মনে হয় না জহির সাহেবের। মুনাও ফিশ ফ্রাই খেতে থাকে। শেষ হলে দুজনেই কফি খায়। কফি দুজনেরই পছন্দ। ব্ল্যাক কফি। মুনার ঘুম হয় না। ঘুমের ট্যাবলেট খায় প্রতিরাতে। তবু কফি ছাড়তে পারে না। কফিটা উপভোগ করে।

কফি খেতে খেতে মুনা হঠাত মুখ খুলে। জহির সাহেবের দিকে তাকিয়ে একটা লজ্জাবনত হাসি বিনিময় করে। পরে মুখ ফিরিয়ে নদীর দিকে তাকায়।

আমার খুব ইচ্ছা ছিল অনেক উচু থেকে নগরীর দৃশ্য দেখবো। চাঁদনী রাত হলে আরও ভালো।

আজ তো চাঁদনি রাত। জহির সাহেব যোগ করে। চলেন তাহলে আজই যাই। ৮০ তলা ভবন রয়েছে যেখানে ছাদ রেস্তোরাঁ রয়েছে। মুনা সম্মতির চোখে তাকায়। ডাগর চোখে। দুজনেই উঠে দাঁড়ায়। জহির সাহেব হাত বাড়ায় হ্যান্ডশেক করার ভঙ্গিতে। মুনা হাত বাড়ায় না। বলে আমাদের কি প্রথম দেখা হলো নাকি যে হ্যান্ডশেক করতে হবে, চলেন চলেন। দুজনে এগিয়ে যায়। ট্যাক্সি ডেকে ট্যাক্সিতে ওঠে। জহির সাহেব গম্ভীরভাবে বসে আছে। হ্যান্ডশেক প্রত্যাখ্যাত হওয়ার অপমানবোধটুকু তিনি লুকাতে পারছেন না। ড্রাইভারকে লোকেশন বলে আর নিজের গুগল ম্যাপও অন করে রাখে। মাত্র বিশ মিনিটের পথ। মুনাও চুপচাপ বসে আছে। ভাবছে। হঠাৎ জহির সাহেব হ্যান্ডশেক করতে চাইলো কেন? তিনি কি আরও ঘনিষ্ঠ হতে চান? কতটা ঘনিষ্ঠ? শারীরিক সম্পর্ক? নাকি বিয়ে? বিয়ে কি তিনি করবেন? স্ত্রী ও চার সন্তানকে রেখে কি তিনি বিয়ে করতে রাজি হবেন? বিয়ে যদিও ইসলামসম্মত হবে তার স্ত্রী কি রাজি হবেন? তিনি কি এত বড় বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন? মনে হয় পারবেন না। না পারলে তবে কি কেবল শারীরিক সম্পর্ক চান? সেটা তো ধর্মীয়ভাবে সংগত হবে না। এরকম সম্পর্কে মুনার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। তবে কি লোকটি প্লেবয় টাইপের কেউ? যে সবার সাথেই শুতে পারে। তাহলে তো মুশকিল। মুনা ভাবনার কোনো আগামাথা পায় না। লোকটিকে মুনার খুব ভালো মানুষ মনে হয়। বড় মনের মানুষ। কথা

ও কাজে মিল আছে। খুব সামাজিক ও দরদী। মানুষের বিপদে কাছে থাকে। আগলে রাখার চেষ্টা করে। অযথা ভাবসাব নেই। সবচেয়ে বড় বিষয় যে লোকটির অনুভূতি ক্ষমতা গভীর। মানুষের হার্দিক সমস্যা শোনা ও বোঝার মতো মনন ও মগজ আছে। নানা কথা ও আচরণে মানুষের হাজার অনুভূতির সুক্ষ্ম প্রকাশ তিনি করেনও। এ কারণেই মুনা লোকটিকে পছন্দ করে। বিশেষ করে শুনবার মতো ধৈর্য আছে। আছে অনুধাবন ক্ষমতাও। এতসব ভাবতে ভাবতে মুনা নিজেই লজ্জা পায়। মুনা কেন এত বেশি করে ভাবছে বিষয়টিকে। মুনা কি দুর্বল হয়ে পড়েছে? মুনা কি শারীরিকভাবে জেগে ওঠে জহির সাহেবের জন্য? যদি তাই না হবে তবে এত ভাবনা কেন আসে মনে! দুজন বিদেশে প্রশিক্ষণে এসেছে বিদেশে। কাকতালীয়ভাবে দেখা হয়েছে। দুজন পরিচিত মানুষ এমনিতেই ভ্রমণ করতে পারে। এর মধ্যে এত গভীরে ভাবার কিছু নেই। সম্বিত ফিরে পেয়ে মুনা আবারও লজ্জা পায় মনে মনে। জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকে।

ট্যাক্সি থামে। যেখানে নামলো দেখা যাচ্ছে বিশাল বড় এক আবাসিক হোটেল। পাঁচতারকা হোটেল মনে হচ্ছে। মুনা ভেবে পাচ্ছে না এখানে নিয়ে আসলো কেন। তবে কি জহির সাহেব তাকে আবাসিক হোটেলে নিয়ে আসলো? কোনোরকম অনুমতি ছাড়াই! রিসিপশনে গিয়ে জহির সাহেব যখন কথা বলছিল তখান মুনা মুখ ফসকে বলেই ফেললো 'আমরা এখানে কেন? এই নিরিবিলি জায়গায় কেন? আমরা ছাদ রেস্তোরাঁয় পাবলিক প্লেসে যাবার কথা, 'ছাদ রেস্তোরাঁতেই যাচ্ছি। ওয়েট অ্যান্ড সি।' জহির উত্তর দেয়।

রিসিপশনিস্ট লিফট দেখিয়ে দেয়। জহির সাহেব পা বাড়ায়। মুনা নিজেও সন্দেহ মন নিয়েই অনুসরণ করে। লিফটে উঠে যখন ৮০ বাটন চাপ দেয়, তখন মুনার সন্দেহ কিছুটা কমে। মুহূর্তেই ৮০ তলায় চলে আসে লিফট। নেমে আরও এক তলা হেঁটে উঠে দেখে বিশাল এক রেস্তোরাঁ। ছাদের চারপাশে ছোট ছোট টেবিল। জোড়ায় জোড়ায় বসে আছে অনেক লোক। কোথাও কোথাও পারিবারিক বা বন্ধুবান্ধবদেরে আড্ডার মতো বড় টেবিল। লোকে লোকারণ্য পুরো রেস্তোরাঁ। ছাদের এক পাশে কার্নিশের একটি টেবিলে দুজনে বসে। নগরীর চারপাশ দেখা যাচ্ছে। আলোকোজ্জল নগরীর স্কাইভিউ দেখে মন চনমন হয়ে উঠে মুনার। অনেক দিনের স্বপ্ন ছিল এরকম একটি জায়গায় আসার। এসে ভালো লাগলো। আকাশে চাঁদ। আর রেস্তোরাঁয়

বাজছে হালকা রিদমের ইংরেজি গান। সব মিলিয় পরিবেশটা দারুণ। রোমাঞ্চকর, আনন্দদায়ক এ পরিবেশ এমন যে চাইলে উদাসও হওয়া যায়, আবার লাফালাফিও করা যায়। নৃত্যও করা যাবে। জহির সাহেব ড্রিংকস করে না। মুনাও না। দুটি জুস নিলো। দুজনে টুংটাং কথা বলছে আর নগরীর ভিউ দেখছে। উপর থেকে রাস্তার গাড়িগুলোক জোনাকি পোকা মনে হয়। কিলবিল করে রাস্তা দিয়ে চলছে। দুজনের আলাপে পুরণো কর্মস্থলের কথাই ঘুরে ফিরে আসে। এর বাইরে কবিতার কথা, ধর্ম ও রাজনীতিও কিছুটা আসে। কথা খুব কমই হচ্ছে। অনেকক্ষণ চুপ থাকার পরে একজন একটা কথা তুলে, অন্যজন উত্তর দেয়। এরকম নিরামিষ আলাপ।

তারপর আপনার সিংগেল জীবন কেমন যাচ্ছে? জানতে চায় জহির। মুনা কী জবাব দেবে তা নিয়ে ইতস্তত করে পরে মুখ খুলে। আমার জীবন তো এখন অনেক আরামের। অফিস করি, কাজ করি। ঘোরাঘুরি করি। বাসায় ইচছামতো রান্না করি, ঘুমাই, গান শুনি, মুভি দেখি। তথা মনে যা চায় তাই করি। স্বাধীন জীবন। আমার খুব বিন্দাস লাগে। চিল করি সবসময় যখনই সুযোগ পাই। 'তবে চোখের নিচে কালি কেন?' জহির সাহেব জানতে চায়।

ঘুম হয় না। হলেও খুব কম হয়। ডাক্তার দেখিয়েছি। ঘুমের অনেক ওষুধ দিয়েছে। কিন্তু তবু ঘুম হয় না। অনেক রাত তাকিয়ে থেকেই চলে যায়। নানান ডোজের ঘুমের ওষুধের নাম বলে যায় মুনা।

এরই মাঝে আরও দুটো আইসক্রিম অর্ডার দিয়ে দেয় জহির সাহেব। আইসক্রিম খেতে খেতে জহির সাহেব বুঝতে পারে যে মুনার ঘুমের ওষুধের ডোজের মাত্রা সাংঘাতিক। তাও ঘুম হয় না।

'তার মানে আপনি ভালো নেই।' স্বগতোক্তি করে জহির সাহেব। একটু আগে বলছিলেন খাও-দাও ফুর্তি করে, মোজ-মাস্তি করে বিন্দাস জীবন কাটাচ্ছেন। আসলে নির্ঘুম রাত আর চোখের নিচের কালি বলে দিচ্ছে যে আপনি ভালো নেই। আসলে একটার অভাব আরেকটা পূরণ করতে পারে না। একজন সঙ্গীর অভাব অন্য কিছু দিয়ে পুরণ হবার নয়। জীবনে সম্পদও লাগে, বিদ্যাও লাগে। স্বাধীনতাও লাগে, পরাধীনতাও লাগে। একা থাকাও লাগে, আবার প্রয়োজনের সময় সঙ্গীও লাগে। সারাক্ষণ সঙ্গীর ঠোকাঠুকি ও প্যানপ্যান যেমন ভালো লাগে না। তেমনি সারাক্ষণ একাও ভালো লাগে না। ভালো জীবনও লাগে মন্দ জীবনও লাগে। না হলে সবকিছু পানসে লাগে।

এসব কথা বলে জহির সাহেব কী বোঝাতে চায় তা বুঝতে পারে না মুনা। জহির সাহেব কি তবে জড়াতে চায় মুনার জীবনে? সেটার রকম কী হবে, মোডাস অপারেন্ডি কী হবে, বাস্তবে কীভাবে চলবে, ধর্মীয় ও সামাজিক বাধার কী উপায় হবে—এসব ভাবতে ভাবতে মুনা উদাস নয়নে নগরী দেখে। কী সুন্দর নগরী। এত আলোর নহর। এত মোহনীয় ও রঙিন চোখ ধাধানো নগরীর ভবনগুলোতে কি সবাই সুখে আছে? নিশ্চয় অনেক ভবনে অনেক কান্নার নহরও রয়েছে। জাকজমকপূর্ণ নগরীর দুঃখকষ্টগুলোও নিশ্চয়ই ওরকম জাকজমকপূর্ণই হয়। মানে এত গভীর ও বেদনাদায়ক যে তা ভেতরেই ঘটে। এই উজ্জ্বল ধাঁধাময় আলোকচ্ছটায় তা বোঝার উপায় নেই।

দেখতে দেখতে রাত ১১টা বেজে যায়। দুজনে নেমে ট্যাক্সি নিয়ে নিজেদের হোটেলে চলে আসে। মুনা জানতে চায় আবার কখন দেখা হবে? আগামীকাল ক্লাসে। জহির জবাব দেয়।

'এই দেখা না।'

'অন্য দেখা চাইলে আপনি আমার রুমে আসতে পারেন। বা আপনার রুমে আমি যেতে পারি!'

মুনা মনে করিয়ে দেয়, দুজনের রুমেই আরও দুজন রুমমেট আছে। সুতরাং রুমে যাওয়া যাবে না। এসব কথা বলতে বলতে হাসতে হাসতেই দুজন বিদায় নেয়।

পরের দিন ক্লাসে আবার দেখা হয়। চোখে চোখে কিছু কথা হয় বটে, তবে সেসব কথার কী অর্থ দাঁড়ায় তা জহির বা মুনা কেউই ঠিক করতে পারে না। তার পরের দিন দুজনের গ্রুপ দুই শহরে চলে যায়। এক্সপোজার ট্যুরের অংশ হিসেবে বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানে বেড়ানো হয়। তিনদিন পরে যখন তারা আবার ফিরে আসে তখন তাদের ক্লাসরুম ও হোটেল ভেনু ভিন্ন হয়ে যায়। সুতরাং দেখা হওয়ার সুযোগ আর নেই।

জহির সারাদিন ক্লাস শেষ করে শপিংয়ে গেলো। গিয়ে সেখানে পারফিউম দামদর করতেছিল। সেখানেই হঠাৎ করে মুনা হাজির। দুজন দুজনকে দেখে নিজেরাই অবাক বনে গেছে। কাকতালীয়ভাবে কী করে এখানে আবার দেখা হলো। এর মধ্যে প্রকৃতির কোনো লীলা আছে কিনা এ প্রশ্নও তোলে জহির। বলে, 'নিশ্চয়ই তোমার সাথে আমার কোনো কানেকশন আছে, না হলে এরকম কাকতালীয়ভাবে দেখা হবে কেন?'

মুনা হেসে উড়িয়ে দেয়। 'আরে না। পৃথিবী গোল, আর কাজ, কেনাকাটা ও অফিসিয়াল ধরন এক বলে হয়তো দেখা হয়ে যাচ্ছে। এর সাইন্টেফিক ব্যখ্যা আছে।' জহির মুনার বৈজ্ঞানিক সিরিয়াস উত্তর শুনে আর কথা বাড়ায় না। জহির সাহিত্যমনা মানুষ। তার জগত ভিন্ন অনুষঙ্গ দিয়ে গড়া। সুতরাং মুনা হয়তো তাকে বুঝবে না। জহির মুনাকে ডিনারের আমন্ত্রণ জানায়। সামনেই একটি থাই রেস্তোরাঁ দেখা যাচ্ছে। মুনা এখনো ডিনারের টাইম হয়নি বলে হালকা এড়ানোর ভান করে। কিন্তু এমনভাবে তাকায় যে, ডিনারের প্রস্তাবটাই সে চাচ্ছিল। কিন্তু মুনা তা প্রকাশ করতে রাজি না। মুনার ভেতর যত ঝড়ই বয়ে যাক, মুনা নিজেকে সংবরণ করে রাখে। প্রকাশ করে না। বরং খটমট আচরণ করে, মাঝে মাঝে পাত্তা না দেওয়া ও এড়িয়ে যাওয়ার মতো কঠিন আচরণ করে। সে কারণে জহির প্রায়ই মনক্ষুণ্ন হয়। অন্যদিকে জহির সামাজিক ও দায়িত্বশীল ভালো মানুষ হিসেবে খুবই আন্তরিকতা প্রকাশ করে। নিজেকে মেলে ধরে। ঠাট্টা, হাসি ও রোমান্টিকতার বিষয়গুলো স্বতস্ফুর্তভাবে প্রকাশ করে। সে কারণে মুনার ভেতরে নানান ধরনের কল্পনার ফানুস ওড়ে। জহিরকে নিয়ে নানান গভীর ভাবনা ভেবে অতলে হারায়।

যাই হোক, দুজনে ডিনারের জন্য থাই রেস্তোরাঁয় ঢুকলো। রেস্তোরাঁর নাম কুব কাও কুব প্লা। কিছু রেসিপি অর্ডার করলো। ক্রিসপি লাইমলিফ হানি যোগে কোরাল, নারকেলমিল্ক ও শাকযোগে স্যুপ, রাইস, চিংড়ি ফ্রাই। খাবার আসতে আসতে দুজনের মধ্যে আবার কথা শুরু হয়। মুনা হঠাত করেই প্রশ্ন করে—

'আপনি আমার কাছে কী চান?'

এ প্রশ্নের ধরণে ও মুনার চাহনির ধরণে জহির চুপসে যায়। কী বলবে ভেবে না পেয়ে, কিছুটা অভিমানে চুপ করে তাকিয়ে থাকে। পরে মুখ খোলে।

'তোমার কাছে আমার চাওয়ার কী আছে? এটা কেমন ধরনের প্রশ্ন! তোমার কাছে আমি কিছুই চাই না। তোমার কাছে আমার চাওয়ার কিছুই নেই। কিছু পাবো তেমনটা আশা করি না। বরং তোমাকে আমি দিতে চাই। তুমি নিতে পারবা কিনা সেটা বলো। না নিতে পারলে সেটা তোমার সমস্যা। সে প্রসঙ্গ তোলা থাক। আমাকে এরকম প্রশ্ন করার কোনো মানে নেই। আমি তোমার কাছে কিছুই চাই না। কিচ্ছু না।'

বলার ধরনে কিছুটা অভিমান ও রাগ প্রকাশ পায়। মুনা তা বুঝতে পেরে

হাসি দিয়ে পুরো পরিস্থিতিটাকে উড়িয়ে দিয়ে স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু সেই চেষ্টা বৃথা যায়। মাঝে মাঝে এমন হয়, বুকের ভেতর এমন সব বাজনা বাজে, মনোজগতে এতসব খেলা খেলে যে তা বলাও যায় না, সওয়াও যায় না। তখন হাসি দিয়েই আমরা পরিস্থিতির স্বাভাবিকতা আনার চেষ্টা করি বটে। তবে স্বাভাবিক হয় না। বরং অপ্রস্তুত ও বিব্রতবোধ চেহারায় এমনভাবে ফুটে উঠে যে তা আরও হাস্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করে।

এরই মধ্যে খাবার চলে আসে। জহির ক্রিসপি লাইমলিফ হানি যোগে কোরাল মুখে তুলে নিয়ে খেতে শুরু করে। মুখে দিয়ে চোখ বন্ধ করে এমনভাবে খাচ্ছে যেন বেহেশতি খানা। মাঝে মাঝে নারকেলমিল্কযোগে শাকের স্যুপটাও খেতে থাকে। আর ইয়াম্মি ইয়াম্মি বলে আওয়াজ করে। মুনার এসব খাবার ভালো লাগে না। বিদেশি খাবার সে খেতে পারে না। সামান্য একটু মুখে দিয়ে ক্ষুধা নিবারণের চেষ্টা করে। বাংলাদেশি মশলা ও রান্নার ধরন না হলে মুনা খেতে পারে না। সবকিছুতে বমি বমি ভাব আসে।

বমির কথা বলাতে জহির ঠাট্টা করে বলে 'বাচ্চা কবে হবে? আবার কার থেকে বাচ্চা নিলে?' শুনে কপট রাগ করে মুনা বড় চোখ করে তাকায়। দুজনেই হেসে হেসে খাবার উপভোগ করে। এভাবেই ঘন্টা দুয়েক কাটিয়ে ঘোরাঘুরি করে উইন্ডো শপিং করে। কেনার চেয়ে কথাই যেন বেশি উপভোগ্য। ঝগড়া, খুনসুটি, খোঁচাখুচি করে সময় কেটে যায়। হয়ে যায় রাত। তারপর দুজন বিদায় নেয়। তারপর আর তাদের সিঙ্গাপুরে দেখা হয় না।

দেশে ফিরে আসে। নিজেদের অফিস ও কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যায়।

বেশ কয়েকমাস পরে কিংবা বছরখানিক পরে একদিন মুনা ইনবক্সে নক করে।

আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন??

: আমাদের আর খবর! কে নেয় অধমের খবর?

: এই তো খবর নিলাম।

: এতদিন পরে! এতদিন খবর না নিলে ভালো থাকি কী করে?

: এই প্রশ্ন তো আমিও করতে পারি। আমার খবরও তো আপনি নেন না।

: আমিতো নক করি নি কারণ তুমি প্রশ্ন করবে 'আমি কি চাই।' তাই নক করি না।

: শুধু কথাটাই মনে রাখলেন। আর মনোভাবটুকু বোঝার চেষ্টা করলেন না।

: মানুষ তো কেবল প্রকাশটুকুই বুঝে। মানুষতো আর অন্তর্যামী না যে ভেতরের খবরও জানবে।

মুনা কিছুক্ষণ চুপ থেকে ইনবক্সে আবার লেখে—

: আজ আমি সিরিয়াসলি একটি বিষয় বলার জন্য নক করেছি।

: ঠিক আছে বলো। জহির সায় দেয়।

: আমি আপনাকে কিছু একটা বলবো। আপনার কাছে কিছু একটা চাইবো। আপনি না করতে পারবেন না। রাজি?

: কী? টাকা পয়সা?

: আরে না। আমাদের সম্পর্কের বিষয়। আমি সিরিয়াসলি ভেবেছি। আমি এখন যা বলবো তা আপনি রাখতে হবে। না করতে পারবেন না।

: আগে বলো শুনি।

: না, আগে কথা দেন। যে আপনি ফিরিয়ে দেবেন না।

জহির চিন্তায় পড়ে যায়। কী না কী চায়। কী হয়েছে কে জানে। কতটা গভীরে গেছে কে জানে। জহির বুঝতে পারে যে আর বাড়তে দেওয়া ঠিক হবে না। সম্পর্কের ডালপালা এখানেই কাট করা উচিত। সমাজ, ধর্ম, পরিবারের নানান বিষয় থাকে। সব ছাপিয়ে হুট করে কোনো সিদ্ধান্ত দেওয়া যাবে না। তাই নিজেদের লাগাম টানাই ভালো। জহির আর কোনো রিপ্লাই দেয় না। ইনবক্সে তাকিয়ে থাকে অনেকক্ষণ। পরে মিউট করে দেয়।

মুনাও কয়েকবার হ্যালো, কী বিষয়? রিপ্লাই দিচ্ছেন না কেন? ইত্যাকার প্রশ্ন করে। কতক্ষণ পরে থেমে যায়।

যোগাযোগের সকল মাধ্যম বন্ধ হয়ে যায়। ফোন, দেখা সাক্ষাৎ, সোশ্যাল মিডিয়া।

সব বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরেও মুনা ও জহিরের মনোজগতে একে অপরের বিষয় খেলা করে কিনা তা হয়তো প্রকৃতি জানে। প্রতিবেশীরা জানে না। জানে না তাদের নিকটাত্মীয় ও স্বজনরাও। কিছু বিষয় এমনি গোপনে ঘটে, গোপনে থাকে। কোথাও দেখা যায় না, শোনা যায় না। তবু সমস্ত জুড়ে থাকে। কিংবা থাকে না। কেবলি আকাশের বাষ্পরূপে এই আছি এই নাই ধরণে আসে আবার হারিয়ে যায়।

দাম্পত্যরস

অভি সিএনজি থেকে নেমে সোজা ঘরে ঢুকলো। তনু বরাবরের মতোই স্বামী ঘরে এসে কাপড় ছাড়তে না ছাড়তেই লেবু শরবত হাতে দিল। অভি শরবতটা এক টানে পান করে নিল। ঢুকে গেলো বাথরুমে। শাওয়ার ছেড়ে দিয়ে আরামে ভিজছে। ভিজছে আর ভাবছে তার বউ কপাল ভালো। তার সবদিক বউ খেয়াল রাখে। যখন যা প্রয়োজন তা হাতের কাছে পায়, পছন্দের রান্না হয় ঘরে, আয়েশ করে খায়। কাপড় ইস্ত্রি করা থাকে। এটা সেটা যখন যা প্রয়োজন তা প্রয়োজনের আগেই প্রস্তুত থাকে। এসব ভাবতে থাকে আর আরামসে শাওয়ারে নিজেকে ভেজাতে ভেজাতে মিষ্টি মধুর ভাবনায় হারাতে থাকে। তখনও অভি জানে না, কী ঘটতে যাচ্ছে!

তনু ঘরের সব গুছিয়ে রাখে। অভি বাথরুমে গিয়েছে, এ ফাঁকে সে অভির কাপড়চোপড় ব্রিফকেস থেকে খুলে গুছিয়ে রাখছে। আর যে প্যান্ট ও শার্ট পরে এসেছে সেগুলো ধোয়ার জন্য বালতিতে ভেজাবে। ময়লা কাপড় বা অগুছালো ঘর তনুর দুই চোখের দুশমন। বালতিতে কাপড় ভেজানোর আগে শার্ট প্যান্টের পকেট চেক করে নেয়। কারণ টাকা বা জরুরি কাগজ থাকলে তা ভিজে যাবে। প্যান্ট এর পকেট থেকে টাকার বদলে একটি কনডমের প্যাকেট পায়। সেটা সমস্যা না। প্রতিবারই ঢাকা থেকে ফেরার পথে সে কনডম নিয়ে আসে। তনু পিল খেতে পারে না কখনোই। এ নিয়ে অভির সাথে অনেকবার তর্ক হয়েছে। কনডম ছাড়া তনু পছন্দ করে না। আর কনডমসহ অভির পছন্দ না। তবু দুজনের বাহাস শেষে অভি কনডমের ব্যবহার মেনে নেয়। তনু পিল খায় না। কারণ মাথা ঘুরায়, শরীরের অনেক সমস্যা তৈরি হয়।

কনডম সবসময় ঢাকা থেকে আসার সময় নিয়ে আসে। সেটা সমস্যা

না। কিন্তু আজকের কনডমের প্যাকেটটা ছেঁড়া এবং তিনটির মধ্যে একটি কনডম নেই। সেটা দেখে তনুর মাথা হ্যাক হয়ে যায়। দোকানদার কি কম দিল? সেটা তো হবার কথা না, কারণ প্যাকেট দেখেই তো সে কিনেছে। তবে আরেকটা কনডম কোথায় পড়লো? পড়ার তো কথা না, যদি না খুলে থাকে। যদি খুলে থাকে তবে খুলবে কেন? মাত্র তো বাসায় এলো। তবে কি গত রাতে কোথাও সে ছিল? থাকলে কোথায়? হোটেলে তো ছিল। হোটেলে তো কয়েক ঘণ্টা ঘুমালো। সেখানে কনডমের কি কাজ? তবে কি কারো সাথে ...। তনু আর ভাবতে পারে না। মাথা গরম হয়ে যায়, চান্দিতে আগুন ধরে যায়। কাপড়গুলো ছুড়ে ফেলে দেয়। কনডমের প্যাকেট হাতে নিয়ে বিছানায় শক্ত হয়ে বসে থাকে। আর রাগ ও ক্ষোভের মিশেলে টেনশন আর কল্পনার ডালপালা মেলতে থাকে। ভাবনার কোনো কূলকিনারা পাচ্ছে না।

অভি একটি ব্যাংকে ছোট চাকরি করে। পরিবার গ্রামে থাকে আর অভি ঢাকা থাকে। প্রতি সপ্তাহে গ্রামে আসে। ঢাকা থেকে কুমিল্লা খুব বেশি দূরে নয়। গত বছরও কুমিল্লাতে পোস্টিং ছিল। এক বছর ধরে ঢাকার হেড অফিসে পোস্টিং। তাই ঢাকায় থাকে। গতরাতে ঢাকা থেকে এসে কুমিল্লায় পৌঁছাতে অনেক রাত হয়ে যায়। তাই গভীর রাতে গ্রামে যেতে পারেনি। রাতে কুমিল্লা শহরে একটি হোটেলে কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়ে সকালে বাড়িতে আসে। এসেই গোসলে ঢুকে। অভির গোসল থেকে বের হওয়া পর্যন্ত তার অপেক্ষা করতে তর সইছে না। তনু ভাবতেই পারছে না, অভি এরকম কিছু করতে পারে। তার ফেরেশতাতুল্য স্বামীর পক্ষে খারাপ কিছু অসম্ভব। বিশ বছরের সংসার। তিন সন্তান বড় হয়ে গেছে। বয়স ৪৫ পার করেছে দুজনেই। এরকম কিছু করতে পারে না তার স্বামী। কখনো এমন কিছু হতে পারে—এটা কল্পনাও করতে পারছে না তনু। স্বামী স্ত্রীর সংসারে বাস করলে নানান ধরনের সান্নিধ্য বজায় থাকে। সেখানে কিছু ঘটলে টের পাওয়া যায়। মেয়েরা একটু বেশিই টের পায়। সেরকম কিছু কখনোই তনুর মনে হয়নি। কিন্তু আরেকটা কনডম গেলো কোথায়? বিশ বছরের সুখের সংসারে কি তবে আগুন লেগে গেলো? কে সে যে এ আগুন লাগালো। কত দিন ধরে এ সম্পর্ক চলতেছে? কোথায় পরিচয়? কীভাবে কি হলো? আমি এতদিন ঘুণাক্ষরেও টের পেলাম না। আমাকে ঘুমে রেখে এত বড় প্রতারণা! তনু আর ভাবতে পারছে না।

অভি বাথরুমে থেকে বের হচ্ছে না। শাওয়ার ছাড়ার আওয়াজ পাওয়া

যাচ্ছে। গুনগুন গানও শোনা যাচ্ছে। তনু কয়েকবার নক করেও কোনো রিপ্লাই পাচ্ছে না। দাঁত মুখ খিচে দুটো গালি দিয়েই আবার বিছানায় বসেছে। তবে কি বিয়ের আগে যে সম্পর্ক ছিল তাদের কেউ হবে? অভি তো কখনোই কোনো সম্পর্ক স্বীকার করেনি। অভির দূর সম্পেকের্র এক বোনের কাছ থেকে শুনেছিল। বলেছিলো, বন্ধু ছিল সব। রুনা নামের একটি মেয়ের বিষয়ে অভির বন্ধুরা খুব খোঁচা দিতো। ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় ফার্স্ট ইয়ারে থাকতে সম্পর্ক ছিল রুনার সাথে। রুনা দেখতে সুন্দরী ছিল। বড়লোকের মেয়ে ছিল। বড় লোকের মেয়েদের তো নানানরকম কাহিনি থাকে। রুনার বাবা অন্যত্র বিয়ে দিয়েছিল রুনার অমতে। সেই রুনার সাথে কি এখন আবার আশনাই! বিয়ের আগে যাই হোক, সেসব নিয়ে তনুর কোনো ভাবনা ছিল না। বিয়ের পরে তো তনু অভির মধ্যে কোনো বিষয় খেয়াল করেনি। রুনা হোক আর যেই হোক তাদের সাথে যোগাযোগ কীভাবে হবে? কোথায় শুরু কোথায় শেষ—কিছুই অনুমান করতে পারছে না তনু। কল্পনার ডালপালা মেলে তনুর মানসিক অবস্থা যা তা।

এর মধ্যে কয়েকবার তনুর শাশুড়ি হাঁক দিয়েছে। একবার এসে ঘুরেও গেছে। বলে গেছে অভি বাথরুম থেকে বের হয়ে খেতে বসবে। ওর খাবার পরিবেশন করে দাও। রান্না তনু নিজেই করেছে। অভির যা খেতে পছন্দ তাই রেঁধেছে। শাশুড়ির ডাকের উত্তরে তনু নরম করে কেবল বলে 'আসছি মা।' কিন্তু মনের ভেতর যে ঝড় বইছে তা আর বলতে পারছে না। প্রকাশও করতে পারছে না। সামনে যা আছে তা সব ভেঙে ফেলতে ইচ্ছে করছে। রাগে ক্ষোভে সারা শরীর কাঁপছে। মনে মনে বলছে তোরে আজ জন্মের খাওয়া খাওয়ামু। বাথরুম থেকে বের হয়ে নে। কিন্তু অভির বের হবার কোনো নাম গন্ধ নেই!

অভির বরাবরই গোসলে সময় লাগে। এক ঘণ্টার কমে গোসল করতে পারে না। মেয়েদের গোসলে সময় লাগে। কিন্তু পুরুষ মানুষের গোসলে এত সময় লাগে কেন—এ প্রশ্নের কোনো উত্তর পাওয়া যায় না। অনেকবার ওকে বলা হয়েছে। জরুরি কাজের সময়ও অভি গোসল করে লম্বা সময় নিয়ে। খেতে বসলেও অভির দেরি হয়। ৩০-৪৫ মিনিটের কমে খেতে পারে না। মুখে নাকি পানি আসে না। প্রচুর সময় নেয় সে। এ নিয়ে অভির মা-বাবাও অনেক বকাঝকা করতো। কোনো লাভ হয়নি। এখন সন্তানরা মাঝে মাঝে

গোসলে যেতে পারে না তাদের বাবার গোসলে লম্বা সময় বাথরুম দখল করে রাখার কারণে।

আজও বের হচ্ছে না। তনুর আর তর সইছে না। কখন বের হবে, কখন জিজ্ঞাসা করবে। কখন বিষয়টার সুরাহা করবে। গত কয়েকদিন আগে পত্রিকার একটি নিউজ পড়ে তনুকে শুনিয়েছিল। সেখানে দ্বিতীয় বিয়ে করার কী কী উপকারিতা ইত্যাদি লেখা ছিল। হাসতে হাসতে বলেছিল। তনুও হাসতে হাসতেই উত্তর দিয়েছিল। অভি কি তাহলে ইচ্ছে করেই এসব নিউজ পড়ে শুনিয়েছিল। তলে তলে এতদূর এগিয়ে গিয়েছে? তবে কি অভি বিয়ে করে ফেলেছে? নাকি কেবলই গার্ল ফ্রেন্ড? তনুর ভাবনার দোলাচল যেন খেই হারিয়ে যাচ্ছে। আর পারছে না।

দুই মেয়ে কলেজে গিয়েছে। একটু পরেই আসবে। মেয়েরা আসার আগেই বিষয়টা নিয়ে কথা শেষ করতে হবে। মেয়েদের সামনে এ নিয়ে জেরা করা যাবে না। তনু মত পাল্টায়। মেয়েরা আজ আসুক। মেয়েদেরকে সব দেখাবে। দেখিয়ে তারপর সবার সামনেই অভিকে হেস্তনেস্ত করবে। কোনো ছাড় দেওয়া ঠিক হবে না। ঘরে বিয়ের উপযুক্ত মেয়ে রেখে সে কিনা বাইরে গিয়ে ফুর্তি করে বেড়াবে! বিন্দুমাত্র নৈতিকতা থাকলে বিন্দুমাত্র বিবেচনাবোধ থাকলে অভি তা করতে পারে না। তনুর মন বলছে এটা মিথ্যা। এরকম কিছু অভির দ্বারা হতে পারে না। অভি একজন বিবেকবান মানুষ। সমাজের সবাই তাকে ভালো জানে। তাদের মেয়ে দুজন। প্রজ্ঞা ও পারমিতাও বাবাকে অনেক ভালোবাসে। ওরা জানে ওদের বাবা সেরা বাবা। এরকম মানুষই হয় না। সেই মানুষটা এরকম করতে পারে না। তনু নিজেকে প্রবোধ দেয়।

তাদের বড় ছেলে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে হিসাববিজ্ঞানে অনার্স পড়ে। ওর নাম গদ্য। ছেলেও বাবাকে খুব শ্রদ্ধা করে। ছেলেমেয়েদের রেখে অভি অন্য কারো সাথে জড়াতে পারে—এমনটা তনুর ভাবনায় কখনো আসে না। কিন্তু কনডমের প্যাকেটে তিনটা কনডম থেকে আরেকটা কনডম গেলো কোথায়। কনডম গেলো কোথায়, আরেকটি কনডম গেলো কোথায় এই প্রশ্ন তনুর মনে ঘুরতে থাকে। তনুর নিজের জীবনের দিকে তাকায়। তনুর বিয়ের পরে তনু কী কী ভুল বা অন্যায় করেছে তার হিসাব করতে বসে।

তনু ভেবে পায় না কোনো অন্যায়। বড় কী কী অন্যায় করেছে যে কারণে তার স্বামী তার সাথে এমন বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে। বিয়ের আগের কথা

বাদ। বিয়ের পরে তো তনু কারও সাথে কোনো সম্পর্কে জড়ায়নি। কতজনই কতভাবে আকারে ইঙ্গিতে প্রকাশ করেছে। সেগুলো সে শক্ত হাতে হ্যান্ডেল করেছে। কোনো প্রশ্রয় দেয়নি। সুন্দরী হয়ে জন্মালে পুরুষরা একটু আধটু ফ্লার্টিং করবেই। তনুকেও করেছে, এখনো করে। ঘরে বাইরে, প্রতিবেশীতে বা দূরের আত্মীয় স্বজন রয়েছে। নানান জনের সাথে নানান সময়ে দেখা হয়েছে। ওসব ফ্লার্টিং হাসতে হাসতে ফেলে দিয়ে স্মার্টলি ইগনোর করেছে। কখনেই বড় কোনো ভুল করেনি। অভির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেনি।

কেবল একবার এক কাজিন বেড়াতে এসেছিল। কয়েকদিন থেকেছিল এখানে। অভিও ছিল। অভি যখন বাজারে বা গ্রামে ঘুরতে যেতো তখন সেই কাজিন খুব বেশি ফ্লার্টিং করেছিল। তনুর মনেও দোলা দিয়েছিল। কোনো একদিন বিকেলে এক ফাঁকে তনুকে ঝাপটে ধরে চুমু দিয়েছিল। তনু হতচকিত হয়ে ছাড়াতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু এমনভাবে ধরেছিল ও এত গভীর করে চুমু দিয়েছিল যে তনু ছাড়াতে গিয়েও যেন ছাড়াতে পারেনি—এমন একটা সিচুয়েশনে পৌঁছে গিয়েছিল। তবু মিনিটের মধ্যে তনু নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল। নিজের রুমে গিয়ে নিজেকে সামলে নিয়ে শক্ত অবস্থান নিয়েছিল। ওই কাজিনকে ওইদিনই বাড়ি থেকে চলে যেতে বলেছিল ও আর না আসতে বলেছিল। কারণ তনু নিজের উপরই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিল। এ অবস্থাকে আরও বেশি প্রশ্রয় দিলে তনুর সংসারে আগুন লেগে যাবে—এটা তনু বুঝতে পেরেছিল। এবং সেভাবেই সে বিষয়টাকে সামলেছে। তবে কখনোই বিষয়টি অভিকে বা অভির পরিবারের কাউকে বলেনি। সেই কাজিনও আর আসেনি।

যতটুকু হয়েছিল ততটুকু প্রতারণা কিনা বা বিষয়টা অভির সাথে শেয়ার না করা বিশ্বাসঘাতকতা কিনা তা নিয়ে তনু অনেক ভেবেছে। তনুর অনুসিদ্ধান্ত ছিল এমন যে বিষয়টা শেয়ার করলে অভির মনে একটা ফাটল দেখা দেবে। যেহেতু বিষয়টা আর বাড়বে না সেহেতু অভিকে জানিয়ে মনোমালিন্য বাড়ানো কিংবা সন্দেহের অবকাশ তৈরি করা সমীচীন হবে না, এমন চিন্তা তনু শেয়ার করেনি।

তনুর সেই ভুলের খেসারত বিধাতা এখন দিয়েছে কিনা—এটা নিয়ে ভাবতে বসেছে তনু। তনু মেলাতে পারছে না কোনো পাপের প্রাশ্চিত্ত আজ পেতে যাচ্ছে। কে তার সংসারের এ সর্বনাশ করলো!

এসবের মধ্যেই অভি বাথরুম থেকে বের হয়েছে। গুন গুন করে গান

গাইতে গাইতে মাথার চুল মুছছে। মুছতে মুছতে শরীরের লোশন দিচ্ছে। লোশন দিতে দিতে খেয়াল করছে তনু খাটে বসে আছে আর তার দিকে অগ্নিমূর্তি নিয়ে তাকিয়ে আছে। কিন্তু কিছু বুঝে উঠতে পারছে না।

: ড্রেস পরে অভি বললো 'খুব খিধে পেয়েছে। খাবার দাও।'

: খাবার পরে। তুমি এখানে বসো। তোমার সাথে কথা আছে।

: কথা পরে বলো। আগে খাবার দাও। বলে অভি ডাইনিংয়ের দিকে যাচ্ছিল।

তনু হ্যাচকা টান মেরে অভিকে এনে খাটে বসালো। টানের ধরন আর কথার রকমে অভিরও মেজাজ চড়ে যায়। বলে, কী শুরু করছো। কী এমন কথা যে এক্ষুণি শুনতে হবে। আগে খাবার দাও।

: এগুলো কী? তনু হাতে কনডমের প্যাকেট দেখায়।

: এগুলো কি তুমি চেনো না? প্রশ্ন করার কী হলো।

: চেনার বিষয় নয়। কনডমের প্যাকেট ছেড়া কেন?

: আমি ছিঁড়েছি। তাই ছেঁড়া।

: তুমি ছিঁড়েছো কেন? কার সাথে ব্যবহার করেছো? কোথায় ব্যবহার করেছো? তনুর চোখে মুখে প্রশ্ন অগ্নিমূর্তি নিয়ে।

: প্রশ্ন শুনে ও তনুকে দেখে অভি হাসতে শুরু করে। হা হা করে হাসতে হাসতে ভেঙ্গে পড়ে। হাসি আর থামে না।

তনু আবার চিৎকার দিয়ে জিজ্ঞেস করে। হাসি থামাও। হাসি থামিয়ে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও।

: তোমার প্রশ্নের কী উত্তর দিব?

: যা ঘটেছে, যার সাথে ঘটেছে তার বিস্তারিত বলো। বলে তনু অভির চোখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

অভি স্মিত হেসে জবাব দেয়। আমি কনডম ব্যবহার করেছি। কনডম কিনেছি প্রতিবারের মতোই ঢাকা থেকে। তুমি জানো যে গ্রামের বাজার থেকে আমি কনডম কিনি না। গত রাতে কুমিল্লা পৌঁছতে রাত হয়ে যায়। সেখানে হোটেলে ৪ ঘণ্টা ঘুমাই। ভোরে চলে আসি। তবে রাতে হোটেলে ঘুমানোর সময় তোমার কথা মনে হয়েছিল। নিজের হস্ত দিয়ে নিজের কর্ম সারি। সাথে কনডমের সহযোগিতাও নিই। এটাতো স্বাভাবিক বিষয়। এটা নিয়ে তুমি এত রিয়েক্ট করছো কেন?

: সত্য বলছো? তনু অভির মুখে দিকে তাকায়।

: আমি তোমার সাথে মিথ্যা বলি না—তুমি সেটা জানো, উত্তর দেয় অভি।

তনুর শরীর ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ার মতো ঠান্ডা হয়। তনু অভিকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকে। আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমি তোমাকে ভুল বুঝেছিলাম। আমাকে মাফ করে দাও। অভিও অশ্রুসজল চোখে তনুর চুলে হাত বোলাতে থাকে।

স্বর্গ থেকে একটি দৃশ্য এসে পুরো ঘর জুড়ে খেলা করে। ভালোবাসার আবেশ যত বেশি, উত্তাপও তত বেশি তা প্রমাণ করে। সেই উত্তাপে ওরা আবার নতুন কোনো আগুনে পোড়ে, নাকি ভালোবাসার উত্তাপে উত্তাল সাগরে হারিয়ে যায় তা জানতে প্রকৃতি অপেক্ষায় থাকে।

হাবুডুবু জীবন

বেলা তিনটা। রোদেলা দিন। বর্ষাকাল। পানিতে টইটুম্বুর খাল। হালকা স্রোত রয়েছে। খালের পরিষ্কার পানির মধ্যে খেয়া চলে। স্কুল থেকে ফেরার পথে গুদারা (খেয়া) পার হতে হয়। ফুল মিয়া দীর্ঘদিন ধরে গুদারা চালান। ফুল মিঞাকে এই এলাকার সবাই চেনে। দূর গ্রামের কেউ খেয়া পার হতে হলে পঞ্চাশ পয়সা দেয়। আর খালের দুই পাশের গ্রামের তারা ধানের মৌসুমে ধান দিয়ে দেয়। নৌকা পার হওয়ার সময় টাকা দেয় না। সবাই বিনা পয়সায় চলাফেরা করে। তাই ফুল মিঞাকে বর্ষাকালে নাও বাইতে হয়। আর সুদিনে তথা শুকনা সিজনে ধান সংগ্রহ করতে বাড়ি বাড়ি যেতে হয়। বাড়ি বাড়ি গেলে সবাই ধান দিতে চায় না। দিলেও কম দেয়। তবু ফুল মিঞা নাও বাওয়া বন্ধ করে না। নাওয়ের সাথে তার জীবন জড়িয়ে গেছে। একমাত্র মেয়ের বিয়ে দিয়েছে। সংসার চলে এই খেয়া পারাপার করেই। একেকজন লোক আসে আর একেক ধরনের কথা হয়। পথিকদের কথা শুনতে শুনতেই তার জীবন যায়। ক্ষণিকের পথিক হলেও অনেকেই তার কাছে অনেক কথা শেয়ার করে। অত্র অঞ্চলের অনেক খবর তার জানা। প্রতিটি মানুষের নানান রকম সমস্যা, নানান ধরনের কথা শুনতে শুনতে মানুষের বিচিত্র জীবন বিষয়ে তার ধারণা হয়। সব মিলিয়ে এই খেয়া পারাপারের জীবনকে ফুল মিঞা মেনে নেন। এবং আনন্দচিত্তেই তিনি এ খেয়া জীবন উপভোগ করেন।

সেই ফুল মিঞার খেয়া দিয়ে পাশের স্কুলের সব বাচ্চারা পারাপার হয়। পার হওয়ার সময় নাওয়ে (নৌকা) বসে কেউ দুষ্টামি করলে ফুল মিঞা চহির বা বৈঠা দিয়ে মাথায় টোকা দেন। তাই সবাই ভয়ে থাকে। কিন্তু আজ গুদারা পারের সময় নাও ডুবে যাবে যাবে করছে। নিজে নিজে ডুবে যাচ্ছে তা নয়।

কোন ঢেউ নেই। কয়েকজন সিনিয়র ভাই কয়েকজন সিনিয়র আপুকে ঠাট্টা-মস্করা করায় রত। কেউ ইয়ার্কি করলো তো কেউ হাসলো। কেউ এ পাশ কাত হলে অন্যজন অন্যপাশে। কৈশোরের হাসাহাসি মাতামাতির কোনো কারণ লাগে না। আমাদের সিনিয়র ভাই আপুদেরও সেই অবস্থা।

ফুল মিঞার হাঁক কেউ শোনেনি। নাও এদিক ওদিক হেলছে। ডুববে ডুববে ভাব। ওদের খেলা। উচ্ছল নির্মল আনন্দ। আর আমার মরনের ফাঁদ। সাঁতার জানি না আমি। ভয়ে কাঁপছি আমি। মনে পড়ে যাচ্ছে সকাল বেলার কথা। রাতে স্বপ্নে দেখেছিলাম গাছের মগডাল থেকে পড়ে গিয়েছি। সকালে নানুকে বললাম স্বপ্নের কথা। নানু বললেন কোনো বিপদ হয়তো আসতেছে। সাবধানে থাকিস। আমি সাবধানে ছিলাম সারাদিন। আমি সাবধানে থাকলে কী হবে? পৃথিবীতে অনেক কিছুই আমাদের নিজেদের হাতে থাকে না। বহির্জগত বা প্রতিবেশ পরিস্থিতি আমাদের নিয়ন্ত্রণ করে। এখন কী হবে। নানুর আশঙ্কা কি সত্যি হলো?

নাও সত্যি সত্যি ডুবে গেল। হৈ হৈ রৈ রৈ করে সবাই পানিতে পড়ে গেল। সাথে চিৎকার চেঁচামেচি। আমি পানিতে ডুবছি আর জাগছি। সাথে ছিলেন আমিরুল মামা। তার কাঁধে ভর করেই ভেসে থাকার চেষ্টা করছি। সবাই সাঁতরে পারে উঠে গেছে। আমিরুল মামাও উঠে যেত। কিন্তু আমি ছাড়ছি না। শক্ত করে আঁকড়ে ধরে রাখছি। নিজের উপর খুব জেদ হচ্ছে। আমার সাথে যারা ক্লাস থ্রিতে পড়ে সবাই সাঁতার পারে। আমি পারি না। চেষ্টাও করেছি অনেকবার। কিন্তু ভয় কাটিয়ে উঠতে পারিনি। সবাই বলে খুব সহজ। ভয়ের কারণেই কি কৌশল রপ্ত হয় না?

আমিরুল মামা আমাকে ফেলে চলে যেতে চায়। পানির নিচে আমি, পানি গিলেই যাচ্ছি। আমি আরো শক্ত করে ধরি তাকে। তার কাঁধে ভর করে, মাথাটা উপরে তুলে শ্বাস নিই। হাতের বইগুলি কই চলে গেছে বলতে পারিনা। ভয় লাগছে। বই ছাড়া বাড়িতে গেলে নানু কি বকা দিবে? কিন্তু আমার কি দোষ! আমি তো সাতাঁরই পারি না। দুটি ছোট গ্রাম। একটিতে স্কুল নেই। অন্যটিতে আছে। একটি বড় হাক্কা (সাঁকো) পার হয়ে আরেকটি গুদারা পার হয়ে এক গ্রামের সব বাচ্চাকে অন্য গ্রামে যেতে হয়। বিদ্যমান সাঁকোগুলোর হাতল এত উঁচু হতো যে ছোটরা পার হতে পারতাম না। বড়রা যেন পার হতে পারে সেভাবে হাতল থাকতো অনেক ওপরে। কারণ বাচ্চারা

হাক্কাতে উঠে নাড়াচাড়া করতাম। তাই এমনভাবে বানানো যে বাচ্চারা হাতল নাগাল পেতো না। আর এত শক্ত সাঁকোও ছিল না। নড়েবড়ে ভেঙে যাবার উপক্রম রকমের সাঁকো থাকতো। সাঁকো পার হবার সময় একহাতে বই নিয়ে আরেক হাতে সাঁকোর হাতল ধরে আগাতে গিয়ে জীবন যায় যায় অবস্থা হয়। ছোট হাত দিয়ে সাঁকোর উঁচুতে থাকা হাতল নাগাল পাওয়া আর আরেকহাতে বই ধরে রাখা ছিল প্রায় অসম্ভব কাজ। অনন্ত জলিলের জন্যও অসম্ভব কাজ। আমার মতো সাঁতার না শেখা বাচ্চাদের তো আরও খারাপ অবস্থা! মাঝখানে গিয়ে হাউমাউ করে কান্না। পড়ে যাবো মরে যাবো এ ভয়, বুক ঢিপঢিপ অন্তরাত্মা, বই ভিজে যাবে, ভিজে গেলে মার খাবার ভয়, বাষ্পরুদ্ধ থমথম অবস্থা—এরকম বিতিকিচ্ছিরি মনন নিয়ে সাঁকো পার হতাম। কতবার ভেবেছি বড় হলে ব্রিজ দিয়ে দিব। কারণ বড়রা আমাদের ভয় ও বুক ঢিপ ঢিপ বুঝে না। আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে, বড়দেরও জীবনের কোনো কোনো ক্ষণ ওরকম বাষ্পরুদ্ধ ভয়, ঢিপঢিপ অন্তরাত্মা, থমথমে আশঙ্কা, আর অনিশ্চায়তার হয়? হলে নিশ্চয়ই আমাদের কথাও ভাবতো।

পানিতে ডুবতে ডুবতে ডুবতে আমি স্বপ্ন দেখি বড় হয়ে সব খালে ব্রিজ করে দেব। আমি বড় হয়ে এ গ্রামে একটি স্কুল দেব। মক্তবের ছেড়া চাটাইগুলি নতুন করে কিনে দেব। ফুটবলের অভাবে খড়ের মধ্যে পলিথিন পেঁচিয়ে রশি দিয়ে বেঁধে গোলাকার বল বানিয়ে খেলি। বড় হলে গ্রামের সব বাচ্চার জন্য বল কিনে দেবো। আরও কত কী যে ভাবতে থাকলাম।

আমিরুল মামা আবার আমায় ঝাড়া দিয়ে ফেলে দিতে চাইছেন। আমি প্রাণপনে আঁকড়ে ধরে রেখেছি তাকে। একবার আমি ডুবি। আরেকবার আমিরুল মামা ডোবে। একবার আমি, আরেকবার মামা। দূর থেকে যে কেউ দেখলে বাচ্চাদের খেলা বলে ভুল ঠাহর করবেন। আমি চিৎকারও করছি, তবে পানির কারণে মনে হয় চিৎকার দূরে যাচ্ছে না। আচ্ছা আমি কি আর বাঁচবো! মার মুখটা মনে পড়লো। গত সপ্তাহে যখন মাকে ছেড়ে আসি তখন আমায় খুব যত্ন করে ডিম ভেজে খাইয়েছিলেন, এক গ্লাস দুধও সরসহ পরম যত্নে মুখে দিয়েছিলেন। বিদায়ের সময় বারবার মা আঁচলে চোখ মুছছিলেন। দোয়া পড়ে সাড়া শরীরে হালকা থুথু ছিটিয়ে আমাকে বিদায় দিয়েছিলেন। বাবা যখন আমাকে এখানে নানা বাড়িতে রেখে যান, আমার দিকে তাকাতে পারেননি। হয়তো বাবার মন খারাপ করা মুখটা আমাকে দেখাতে চাননি।

মা কি এখন বুঝতে পারছে যে আমি ডুবে যাচ্ছি! মায়ের মন নাকি সব টের পায়। সন্তানের বিপদ হলে সবার আগে মায়ের মনে বেজে ওঠে। মা এখন কী করছে? আমি মরে গেলে কি আমার দেহ বাবা-মায়ের কাছে নিয়ে যাবে? বাবা-মা নিশ্চয়ই কান্না করবে। কতক্ষণ কাঁদবে, কতদিন কাঁদবে? মা-বাবা আমাকে ছাড়া বাঁচতে পারবে না নিশ্চয়ই।

আমিরুল মামার কনুইয়ের সজোরে ধাক্কায় আমার সম্বিত ফিরে আসে। আমি কিছুতেই তাঁকে ছাড়ছি না। তার ওপর ভর করে আবার মাথা তুলে কোনোরকমে শ্বাস নিই। আবার পানির নিচে আমি, আমিরুল মামা ওপরে। আমি ওপরে মামা নিচে। মামা ওপরে আমি নিচে।

আচ্ছা আমি কি বাড়ি ফিরবো? মসজিদের হুজুর কত সুন্দর করে আজান দেন, কথা বলেন। আমি কি ওরকম পারবো? আমার কতদিনের শখ ছিল সুন্দর করে সুরেলা সুরে আজান দেওয়া শেখা, নাতে রাসুল গাওয়া। পাশের গ্রামের চেয়ারম্যান একদিন এসছিল। কী সুন্দর দেখতে। সবাই তাকে খুব সম্মান করে। আমি কি ওরকম চেয়ারম্যান হতে পারবো? চেয়ারম্যান হয়ে এলাকার সব মানুষের সমস্যা দূর করে দেব। ও পাড়ার এক মামা টিভি কিনেছে। টিভিতে কত কিছু দেখায়! আমার কি বড় হয়ে একটি টিভি কেনা হবে না? হিন্দু বাড়ির পূজা দেখতে গিয়েছিলাম। কী সুন্দর প্রতিমা! আমি আবার দেখতে পাবো না? শাজান স্যার আর তাজু স্যারের মতো ভালো শিক্ষক হতে চেয়েছিলাম। সব বাচ্চাকে আদর করে ডাক ছেড়ে 'আয়রে খোকন ঘরে আয়' শেখাবো। তাও কি হওয়া হবে না? আইসক্রিমওয়ালার কাঠের বাক্সের আওয়াজ শুনে কতবার দৌঁড়ে গেছি। মনে মনে ভেবেছি, বড় হয়ে সবগুলি আইসক্রিম কিনে গ্রামের সব বাচ্চাকে নিয়ে একসাথে খাবো। তাও কি হবে না? আমি যেন ভাবনার সাগরে ডুবেছি। পানিতে ডুবতে ডুবতে এত ভাবনা আসছে কেন—তাও বুঝতে পারছি না।

আমিরুল মামা বাম হাত দিয়ে আমার টুটি ধরে এমন জোরে ধাক্কা দিলেন যে আমার হাত ছোটে গেল। আমি টুপ করে ডুবে গেলাম। ডুবে গেলেও মামার একটা পা ধরতে পারলাম। পাটা শক্ত করে টেনে ধরলাম।

যেভাবে মানুষ গাছে ওঠে সেভাবে শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে মামার সারা শরীর বেয়ে তার শার্টের কলার ধরে ফেললাম। আমার শরীরে শক্তি খুব কম। মরে যাবো তাই হয়তো এত শক্তি আজ। কোনরকমে মাথাটা উঁচিয়ে আবার

একটু শ্বাস নিলাম। পাশ দিয়ে একটি ইঞ্জিনের নৌকা যাচ্ছে। ইঞ্জিনের শব্দটা কানে বাজতেছে। রেডিওতে ইরাক যুদ্ধের বোমা ফেলার আওয়াজের মতো শব্দ। গ্রামের সবাই সাদ্দামের পক্ষে। দেশের সবাই সাদ্দামের পক্ষে। জগতের এত মানুষ সাদ্দামের পক্ষে। তবু সাদ্দাম জেতে না কেন—এ বিষয়টা মাথায় ঢোকে না আমার। বুশ নাকি অনেক বোমা ফেলছে ইরাকে। আমার বুঝে আসে না যে বুশ হাজার হাজার বোমা কিনতে পারে আমাদের গ্রামে একটা ব্রিজ দিতে পারে না? ব্রিজ দামি নাকি বোমা দামি। বোমা দামি নাকি ব্রিজ দামি। কথাটা মাথায় ঘুরছে। নানাকে জিজ্ঞেস করতে হবে কিসের দাম বেশি। ইঞ্জিনের নৌকার ঢেউটা আমাদেরকে আরো তলিয়ে দিয়ে গেল। বিপদের সময় সবাই তামাশা করে। যার একটুও ক্ষমতা নেই সেও শেষ লাথিটা দিয়ে যাবে। ঢেউও আমাদের সাথে তাই করলো। ঢেউয়ের চোটে আমরা আবার আরও গভীরে তলিয়ে গেলাম।

আমার আর মামার কসড়ত চলছে। আমি ডুবি মামা জাগে। মামা ডোবে আমি জাগি। আমার হাত-পা ছুড়ে এত চেষ্টায়ও কোনো লাভ হচ্ছে না। আমি আবার পানির নিচে। পানি খেতে খেতে পেট ফুলে গেছে। মাথাটা ঝিমঝিমি করছে। আমাদের কিরণ স্যার বিনা দোষে অভ্যাসবশত ছাত্রদের মাথা দেয়ালের সাথে সজোরে ধাক্কা দিয়ে আঘাত দেন। আমাকেও অনেকবার দিয়েছেন। তখনও এরকম ঝিমঝিম করে। চোখে অন্ধকার দেখি। আমাদের থতমত খাওয়া কালো চেহারার আতঙ্ক দেখে কিরণ স্যার হাসতো। পিশাচের হাসি। এমন শিক্ষকও হয় যে ছাত্রদের আতঙ্কিত মুখ দেখে হেসে উঠে। পানির নিচে এখন অবশ্য অন্ধকার লাগছে না। পানির নিচে সব দেখতে পাচ্ছি। আমাকে তো আগে বাঁচতে হবে। আমার এত কথা মনে পড়ছে কেন? চোখের সামনে সব ভেসে উঠছে। হঠাৎ করে কি আমার কল্পনার গতি বেড়ে গেল।

মনে হয় আমি মরে গেছি। মরে গেলে কোথায় যায়, মরে গেলে কি হয়? আমি কি এখন জীবিত নাকি মৃত? না না, মনে হয় আমি বেঁচে আছি। আমার মনকে বোঝাতে হবে। আমাদের ক্লাশের আমানের কথা মনে পড়ছে। খুব সুন্দর গান গায়। 'আমি কী দিয়া সেচিব নৌকার পানিরে/ তুই সে আমার মন/ মন তোরে পারলামনা বুঝাইতেরে/ হ্যা তুই সে আমার মন।'

মুজিব পরদেশির গান। পল্লিগীতি। আমার খুব ভালো লাগে। কথা বুঝি না। সুরটাই ভালো লাগে। আর কি আমানের গান শোনা হবে না? মুর্শিদী

গানও ভালো লাগে। নানার কণ্ঠে শুনি—'মুসলেম হইতে বহুদিন/ নামাজ পড়ি কোমর বেকা/ রোজা রাখি অঙ্গ শুকা/ খাওয়াইলে হাজার ভুখা/ এতিম মিসকিন/ মুসলেম হইতে বহু দিন।'

ও পাড়ার এক মামার নাম তো মুসলেম। মুসলেম হতে আবার বহুদিন লাগবে কেন? গানের মানে মাথায় ঢোকে না। কিন্তু সুরটা ঠিক মনকে টানে। আমি কি আর গান শুনতে পারবো না? আমিরুল মামা আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। একসাথে ওপরে ওঠার চেষ্টা করলেন। কিন্তু পারলেন না। না পেরে আমার ওপর ভর দিয়ে তিনি মাথাটা তুলে শ্বাস নিলেন। আমারও দম বন্ধ হয়ে আসছিল। আমিও তাকে টেনে ধরে নিচে নামিয়ে মাথাটা ওপরে তুলে কোনোরকমে নিঃশ্বাস নিলাম। আমি পানির ওপরে জাগি, মামা নিচে ডোবে। মামা ডুবে আমি জাগি। আমি ডুবি মামা জাগে। হঠাৎ দেখলাম খালের পাড়ে তাহের মাস্টারকে দেখা যায়। ছাতা হাতে দাঁড়িয়ে। তিনি আমায় হয়তো দেখতে পেয়েছেন। তিনি আমায় চিনেন। তিনি আমার মামাকে পড়ান। তিনি কি আমায় তুলবেন? তিনি কি ঝাঁপ দেবেন? তিনি মনে হয় ঝাঁপ দিয়েছেন। ভুল দেখলাম না তো! কি জানি হয়তো খোয়াব। নানার মুখটা মনে পড়ছে। নানা কত আদর করতেন। নানা কি আমার মৃত্যুকে মেনে নেবে? না নিয়ে কী করবে? প্রিয়জন মরে গেলে নাকি আল্লাহকে প্রশ্ন করা যায় না। জিজ্ঞাসা করা যায় না। বিনাপ্রশ্নে মেনে নেওয়াই খোদার খোদায়িত্ব।

ডুবতে ডুবতে ছোট বোনটার হাসিটা মনে পড়ছে। পটের গানের কথা মনে পড়ছে। ঈশাননগরের পটওয়ালা আবার আসবে। আবার পটের গান শুনবো। ডাঙ্গুলি খেলা মনে পড়ছে। সব স্মৃতি একসাথে চোখে ভাসছে। চারপাশে আধাঁর লাগছে। কালো আঁধার। আমি মনে হয় অতল গহ্বরে হারিয়ে যাচ্ছি। আমি মনে হয় ডুবে যাচ্ছি। আমার সব স্বপ্নগুলিও ডুবে যাচ্ছে। হবে হয়তো। তাহের মাস্টার মনে হয় ঝাঁপ দিয়েছে। মনে হয় আমিরুল মামাকে ধরেছে। কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। তাহের মাস্টার আমার হাতও ধরেছে মনে হচ্ছে। টেনে তুলতেছে। আমার প্রচণ্ড ঘুম পাচ্ছে। আমি মনে হয় ডুবতে ডুবতে ঘুমিয়ে যাচ্ছি। তারপর আমার আর কিছু মনে নেই।

বাতির নিচে অন্ধকার

গণি মিয়া মাঠে কাজ করছে। জমির আগাছা পরিষ্কারে ব্যস্ত। দুপুরের প্রখর রোদ। পিঠ পুড়ে যাবার মতো অবস্থা। তবে সেদিকে গণি মিয়ার খেয়াল নেই। একমনে কাজ করছে। না, কাজ মন দিয়ে করছে তা নয়। অভ্যাসবশত তার হাত চলছে। মন পড়ে আছে অন্য বিষয়ে। আসার সময় তার বউ কড়া করে বলে দিল। মেয়ের জন্য ছেলে খুঁজতে। জরুরি বিয়ে দেয়া দরকার। গণি মিয়ার চোখে ভাসছে। এইতো সেদিন মেয়েটির জন্ম। কয়দিনে বেড়ে উঠেছে। ক্লাস এইটে পড়ে। এখনো সে বাচ্চা। ওকে বিয়ে দেবার কথা চিন্তাই করতে পারছে না। তবে বউয়ের কথাও তো ফেলার মতো নয়। চারপাশে লোকজন বলাবলি করছে। মেয়ে ডাগর হয়েছে বিয়ে দিতে হবে। বউ তার খুব চালু। বুদ্ধি আছে বলতে হবে। চারপাশের খবর রাখে। এই তো প্রতিবেশী সামাদ মিয়ার তিন মেয়ে। বড় মেয়েটার কয়েক বছর আগে প্রতিবেশীদের কথায় বিয়ে দেয়নি। এখন আর বড়টার জন্য বিয়ের সম্বন্ধ আসে না। মেঝোটার জন্য আসে। কিন্তু বড়টাকে রেখে মেজোটাকে বিয়ে দেয় কী করে? এ চিন্তা করে মেজো মেয়েটারও বিয়ের বয়স যায় যায় অবস্থা। ওদিকে ছোট মেয়েটাও বিয়ের উপযুক্ত হয়ে যাচ্ছে। গণি মিয়ার বউ এত বোকা নয়। সে চোখ কান খোলা রাখে। তাই তো সকালবেলা অনেক করে তাকে বোঝাল, মেয়ের জন্য বর খোঁজতে। শুধু বউকেই বা দোষ দেয় কী করে। গত শুক্রবারে নামাজ পড়ে বের হবার সময় হাজী সাহেবও তাকে মেয়ের বিয়ের বন্দোবস্ত দ্রুত করতে বললো। ডাগর মেয়েছেলে ঘরে বেশিদিন না রাখাই ভালো। বিভিন্ন পাপ বা অনাচারের সম্ভাবনা থাকে। মেয়ে বিয়ে দেয়া হজের সমান ছাওযাব। ভেবে দেখলো বউ একেবারে মন্দ কিছু বলেনি।

না গণি মিয়া বউয়ের কথায় উঠে বসে মতো লোক নয়। সে বিনাতর্কে বউয়ের কথা মেনে নেয়নি। সে সকালে বউকে অনেক কথা শুনিয়েছে। পাশের বাড়ির রহমানের মেয়েটাকে ১৩ বছর বয়সে বিয়ে দিল। ১ বছরও সংসার টিকল না। পেটে বাচ্চা নিয়ে বাপের বাড়ি আসতে বাধ্য হয়েছে মেয়েটি। মেয়ে সংসারি নয়, কাজের নয়, আক্কেল বুদ্ধি কম এ অজুহাতে স্বামী তাকে ফেলে যায়। অনেক দেন-দরবার করেও কোনো ফল হয়নি। গ্রাম্য সালিশ তাকে কোনো সহযোগিতা করেনি। শেষে বাচ্চা জন্মের সময় রহমানের মেয়েটি প্রচুর রক্তক্ষরণে বাচ্চাসহ মারা যায়। ডাক্তার বলেছিল খুব কম বয়সে বাচ্চা নেযা ঠিক হয়নি। গণি মিয়া বউকে বলছিল—'কেন রহমানের মেয়ের কথা তোমার মনে নাই? রহমানের মেয়ের ওই অবস্থা মনে করে নিজের মেয়ের ভবিষ্যত চিন্তা কর।' বউ খ্যামটা মেরে গণি মিয়ার কথা ছুড়ে ফেলে দিল। তোমার যা কুডাক ডাকা স্বভাব! শুধু অশুভ চিন্তাই তোমার মাথায় আসে। ওই এক মেয়ের উদাহরণ দিয়ে চিন্তা করলে চলবে? গ্রামে আরো কত মেয়েরেই তো বিয়ে হয়েছে। কই কোন সমস্যা তো দেখি না। ইসমাইল তো তার মেয়েকে বিদেশ থেকেই বিয়ে দিল। নানা হয়ে গেলো। আর তুমি দেশে থেকে মেয়ের জন্য কিছু করতে পারছ না। গণি মিয়া আর কথা বাড়ালো না। বিড়বিড় করে শুধু বললো সব কথা কী আর শোনা যায়? বলেই বেরিয়ে গেল। বউ এরপরও অনেক কথা বলে যাচ্ছে। সেসব কথা গণি মিয়ার কানে আর গেল না।

গ্রামের ওসব কমবয়সে বিয়ে হওয়া মেয়েদের অনেক পারিবারিক দ্বন্দ্বের কথা গণি মিয়া শুনেছে। কিছুদিন আগে পরিবার পরিকল্পনা অফিসারের কথাও তার মনে পড়ছে। তিনি বলেছিলেন 'যে সময় মেয়েটি স্কুল কলেজে সহপাঠীর সাথে পড়াশোনা করার কথা কিংবা হাসিখুশি আর খেলাধুলা উচ্ছ্বলতায় থাকার কথা সেই সময় নেমে আসে এক অভিশাপের কালো মেঘ। বাল্যবিয়ে। সন্তান নেয়ার চাপ, সংসার সামলানোর চাপ ইত্যাদি কারণে কৈশোরের সোনালি দিন বিসর্জন দিয়ে এক যন্ত্রণার কারাগারে বসবাস করে বাল্যবিবাহের শিকার কিশোরী। অপরিণত বয়সে সন্তান জন্মদানের ফলে মেয়ে ও নবজাতক অপুষ্টিতে ভোগে, ভয়াবহ পরিণতিও হয়।' আবার বউয়ের মুখটি মনে পড়ছে গণি মিয়ার। সঙ্গে বাজখাই গলায় প্রশ্নটি 'মেয়ের বয়স বেড়ে গেলে যে দ্বিগুণ যৌতুক লাগবে তা দেয়ার মুরোদ আছে তোমার?' নিজের মেয়ের ভবিষ্যৎ

কী হতে পারে এ নিয়ে ভাবতে ভাবতেই নিজ জমিতে এসে নিড়াতে শুরু করলো। জমির আগাছা কিভাবে পরিষ্কার করতে হয় তা গণি মিয়া জানে, সমাজের আগাছা পরিস্কারের পথ তো তার জানা নাই। জগৎসংসারের এ সর্পিল পথ তার অচেনা।

বাড়ি ফিরেই বউয়ের সাথে পরামর্শ করে মেয়ের বিয়ের বিষয়ে। এক ঘটককে খবর দেওয়া হয়। ঘটক পান খেতে খেতে জানায় বিয়ে দেওয়া কোনো বিষয়ই না। হাজার হাজার পাত্র তার হাতে। মেয়ের জন্য পাত্র ঠিক নিয়ে আসবে। তবে খরচপাতি কিছু করতে হবে। বিদেশ পাঠানো বা দেশে ব্যবসা করার জন্য নগদ ব্যবস্থা না করলে এখন পাত্র পাওয়া কঠিন। গণি মিঞার বউ এসব পাত্তা দিচ্ছে না। পাত্র ভালো হলে মেয়ের ভালোর জন্য যা যা করার তা তা করবে। গণি মিঞা কিছু বলে না। চুপ থাকে। শেষে ঘটক বললো যে, সব তো হলো কিন্তু একটা সমস্যা রয়ে গেলো। মেয়ের তো এখনো ১৮ বছর হয়নি। জন্মসনদ দিয়ে তো বিয়ে দেওয়া যাবে না। একটা নকল জন্মসনদ বের করতে হবে মেম্বারকে ধরে। স্কুলের সনদ দিয়ে বিয়ে দেওয়া যাবে না। কাজী কাবিন রেজিস্ট্রি করাবে না। ঘটকের বুদ্ধিমতো গণি মিঞা হাজির হয় মনা মেম্বারের বাড়িতে। গত নির্বাচনে মনা মেম্বারের জন্য অনেক খেটেছে গণি মিঞা। নিজে ভোট দিয়েছে, পাড়া প্রতিবেশীর ভোট যোগাড় করে দিয়েছে। বিনিময়ে পানও খাননি। মনা মেম্বার ঘটনা শুনে প্রথমে না করেন। পরে গণি মিঞা চাপাচাপি করলে জন্মসনদের ব্যবস্থা করে দেন। ফরমে বয়স পরিবর্তন করে দিয়ে ফর্ম প্রত্যয়ন করে তা জমা দেন ইউপি সচিবের কাছে। ক্লাস এইটে পড়ে এ তথ্য গোপন করে চেয়ারম্যান অফিস থেকে নতুন জন্মসনদ নিয়ে দেন।

২

কয়েক মাস পরের ঘটনা। মনা মেম্বারের মেজাজটা আজ ভালো নেই। গতকাল থেকেই খারাপ। চেয়ারম্যানের মাধ্যমে উপজেলা থেকে খবর পাঠানো হয়েছে। তাকে যেতে হবে। অল্প বয়সী মেয়েকে ১৮ বছর লিখে জন্ম সনদ দেয়ায় ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছে। বড় অফিসাররা থাকেন উপজেলায়। তারা গ্রামের কী

বুঝবেন? গত ভোটের সময় প্রতিবেশী গণি মিয়া তার জন্য কত কষ্ট করেছে! মেয়ের বিয়ে দেবে সার্টিফিকেট নিতে এসেছে। কাজী নাকি সার্টিফিকেট ছাড়া বিয়ে দেবে না। তাই বয়স একটু বাড়িয়ে জন্মসনদ দিয়েছে। এতে কী এমন দোষ হয়েছে? গণি মিঞার জন্য মেম্বার হিসেবে সে এতটুকু করবে না? তাছাড়া মেম্বার হিসেবে তো আয়ও নেই। ২০০/৫০০ টাকা ভাতা ৬ মাস পরপর পাওয়া যায়—তা দিয়ে কী সংসার চলে? লোকজন মাঝে মাঝে এসব জন্মসনদ দেয়ার সময় কিছু টাকা নিয়ে জন্মসনদ দেয় মর্মে অভিযোগ করে। মেম্বার তো কখনো কারো কাছে কোন টাকা চায় না। তবে কেউ খুশি হয়ে দিলে না করবে কেন? গ্রামে একসাথে থাকে। প্রতিবেশী সবাই। জন্মসনদ চাইলে না করে দেবে। তা কি করে হয়? তাছাড়া মেয়েছেলে বাড়ন্ত অবস্থায় থাকলেই বরং ঝামেলা। বিয়ে দিয়ে দিলে বাবা মা নিশ্চিন্ত হয়। ভোটারদেরকে এমন নিশ্চিন্ত হওয়া থেকে সে মেম্বার হিসেবে বঞ্চিত করবে কেন? পাশের ওয়ার্ডের মেম্বার আবার বয়স বাড়িয়ে জন্মসনদ দেন না। লোকজন প্রতিদিন বাজারে দেখা হলে গালাগালি করে। অমুক মেম্বার আইন দেখায়, বাল্যবিয়ের কুফল শোনায়, জ্ঞান দেয়। জন্মসনদ চাইলে ঘুরায়। আমার মেয়ে আমি বিয়ে দেব, মেম্বারের কী সমস্যা? ভোটের সময় তো এত জ্ঞানের কথা ছিল না। এখন এত কথা কেন? পরেরবার ভোট আসুক দেখমুনে!

যতই যুক্তি থাকুক, মনা মেম্বারের উপজেলায় যেতে হবে, এ ভাবনায় মন চটে আছে। সে দুবার চেয়ারম্যানকে ফোন দিয়েছে। চেয়ারম্যান বলে দিয়েছে, অন্যায় করেছো জবাব দিবা। আমারে আর ফোন করে বিরক্ত করো না। কিন্তু পাল্টা জবাবে মেম্বার চেয়ারম্যানকে বলতে পারেনি যে, গত সপ্তাহে চেয়ারম্যান সাহেবের ভাতিজির বিয়ের সনদের জন্যও মেম্বার সাহেব থেকে একটি ফর্মে স্বাক্ষর নেয়া হয়েছে। জন্মসনদ চেয়ারম্যানই দেন। তবে চেয়ারম্যানরা নিরাপদ থাকার জন্য মেম্বার সাহেবদের কাছ থেকে আবেদন ফর্মে স্বাক্ষর/সুপারিশ নেন। তখন চেয়ারম্যান সাহেব ফোন করে বিগলিত সুরে সুপারিশ দিয়ে দিতে বলেন। অথচ এখন কোনো সহযোগিতা করছেন না। জমির ক্রয় বিক্রয়ে উত্তরাধিকার সনদও এরূপ করিয়ে নেন এ চেয়ারম্যান। মেম্বারের এরকম অনেক ঘটনা মনে পড়লেও চেয়ারম্যানকে কিছু বলতে পারলো না। কারণ সামনে টি আর কাবিখার বরাদ্দ আসলে আবার বণ্টনে সমস্যা হবে। এলজিএসপির প্রজেক্ট থেকে তার ওয়ার্ড বাদ পড়বে! দেয়া নেয়ার অনেক

হিসেবের মধ্যে মেম্বারের মাথায় বাল্যবিয়ে কী ও তার কুফল ঢোকার কথা না! যাই হোক পরদিন উপজেলায় গেল। অনেক জেরা আর কথার মাঝখানে মেম্বারের মুখ দিয়ে কোনো কথা আসেনি। তবে হুট করে এটুকুই বলতে পারলো যে, 'গত মাসে যে ৮ নং ওয়ার্ডের মেম্বারনির ১৫ বছরের ছেলের সাথে ৯ নং ওয়ার্ডের মেম্বারের ১৪ বছরের মেয়ের বিয়ে হলো তখনতো কিছু বললেন না, আমি গরীব ভোটার গণি মিঞাকে সহযোগিতা করতে সনদ দেয়ায় আমার দোষটা দেখলেন।' অফিসার তৎক্ষণাৎ চেয়ারম্যানকে ফোন করে ঘটনার সত্যতা পেলেন! তবে আগে জানতে পারেননি। পাত্রপাত্রী অন্য জেলায় আছে! অফিসার নরম করে শুধু এটুকুই বললেন—ঐ মেম্বারের অপরাধ তার, আপনার অপরাধ আপনার। সুতরাং ব্যবস্থা নেয়া হবে। কোনো মার্সি নেই। তবে অফিসার মনে মনে ভাবে—বেড়ায় যখন ক্ষেত খায়, সে খেত কে বাঁচায়! বাতির নিচে অন্ধকার দশা!

৩

রাত বারোটা পার হয়েছে। অফিসার ঘুমে আচ্ছন্ন হলো। হঠাৎ ফোনটা বেজে উঠলো। হ্যালো বলতেই ও পাশ থেকে কেউ একনাগারে কথা বলে যাচ্ছে। 'স্যার আমতলী গ্রামের পূর্বপাড়ার কামাল মিঞার মেয়ের বাল্যবয়ে হচ্ছে। স্যার বিয়েটা ঠেকান। ইত্যাদি। অফিসারের ঘুমটা ভেঙে গেল। ইউপি চেয়ারম্যান আর মেম্বারকে ফোন করে ব্যবস্থা নিয়ে বাল্যবিয়ে বন্ধ নিশ্চিত করে তৎক্ষণাৎ জানাতে বললো। হঠাৎ ঘুম ভাঙলে আর ঘুম আসতে চায় না। অফিসারের মাথায় বাল্যবিয়ের আজব সব ঘটনা ঘুরতে লাগলো। ষাট বছরের বৃদ্ধ ১৪ বছরের মেয়েকে বিয়ে করছে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে হাজির হওয়ার পর মেয়ে ও মেয়ের মা রীতিমতো চার্জ করেছে অফিসারকে। আমার বিয়ে আমি করবো আপনার কী? যেভাবেই বিষয়টিকে মেনেজ করে বরকে আটক করা হয়েছিল। আশ্চর্যের বিষয় পরদিন এ বিয়ের পক্ষে স্থানীয় নেতৃবৃন্দ, সকল বাহিনীর উচ্চ পর্যায়ের পদস্থ কর্মকর্তা, গোয়েন্দা সংস্থার পদস্থ কর্মকর্তাসহ অনেকেই ষাট বছর বয়সী লোকের পক্ষে ফোন করে তদবির করেছিল। তবে বিয়েটা হতে দেয়া হয়নি। আবার বিয়ে হয়তো আটক থাকেনি। অন্য জেলায়

গিয়ে সম্পন্ন হয়ে থাকতেও পারে!

আরেকটি বিয়ে ভাঙার পরদিন জানা গেল মেয়েটির পরিবার এলাকাছাড়া। কারণ আর কিছুই নয়। মেয়েটির বা তার বাবা-মার বিয়ে দেয়ার ইচ্ছে ছিল না। বখাটের হাত থেকে রক্ষার জন্যই বিয়ে ঠিক করেছিল। অফিসার এসে বিয়ে ভেঙে দেন। কিন্তু স্থানীয় বখাটে এত ক্ষমতাবান যে মেয়েটি বা তার বাবা-মা আতঙ্কে এলাকা ছেড়ে শহরে চলে গিয়েছিল। যদিও অনেকে বলেছিল, প্রশাসনকে জানালে প্রশাসন ব্যবস্থা নেবে। ওই পরিবারের উপলব্ধি হলো, প্রশাসন কি প্রতিদিন আমার মেয়েকে পাহারা দেবে? কথাটাতো হালকা নয়। নির্মম সত্য। অফিসারের ঘুম আজকে আর হলো না বুঝি। মাথার ভেতর বাল্যবিয়ের কাহিনির জটলা বাঁধছে। আরেকটি বাল্যবিয়ে বন্ধ করতে অফিসার রওয়ানা হয়েছে। মাননীয় আইন প্রণেতার ফোন। বাল্যবিয়ের পক্ষে সরাসরি কিছু বললেন না। তবে যা বললেন তাতে যা দাঁড়ায় তা হলো—আপনি যান বিয়েটা বন্ধ করে দিয়ে চলে আসেন। পরে আমার লোকজন ব্যবস্থা নেবে। আপনাকে কেউ ফোন দিলে ফোন ধরবেন না। ঠিক আছে? জ্বি স্যার! অফিসারের কপালটা ঘামলো। এও কী সম্ভব? বাল্যবিয়ে সংক্রান্ত আইন তো সংসদেই পাশ হয়েছে! যাক, সে বিয়ের আসরে গিয়ে বরকে পাওয়া গেল না। ঘটককে পাওয়া গেল। কারাদণ্ড দেয়া হলো। এ নিয়ে পরে অনেক হৈ চৈ। তাঁদের কাজ সংসদে আইন করা। তারা এখন এলাকার বাড়ির সীমানা, বিয়ের ঝামেলা, গ্রামীণ বচসা ইত্যাদিতে নাক গলান। এসব তুচ্ছ বিষয়ে সময় দিলে দেশের জন্য মানসম্মত আইন তৈরি করবে কারা?—অফিসার ভেবে পায় না।

অফিসার আবারও এপাশ থেকে ওপাশে ফিরে শোয়। ডান হাতের তালুতে মাথাটা রেখে চোখ বন্ধ করতেই আবার আরেকটি বিষয় মাথায় ঘোরে। বাল্যবিয়ে বন্ধে সাংবাদিকদের ভূমিকা প্রশংসনীয়। অনেক খবরে তাদের মাধ্যমেই আসে। তবে ভিন্ন ঘটনাও আছে। এক সাংবাদিক একবার ফোন দিল। স্যার অমুক গ্রামে আমি আসছিলাম। এখানে একটা বাল্যবিয়ে হচ্ছে। অফিসার আসছি বলে ফোন রেখে দিল। বিশ মিনিট পর ঐ একই সাংবাদিক জানালো স্যার আপনার কষ্ট করার দরকার নেই। আমার ভুল হয়েছে। মেয়েটির বয়স ঠিক আছে। অফিসারের সন্দেহ হওয়ায় ওখানকার মেম্বারকে ফোন দিল। মেম্বারও বললো মেয়েটির বয়স ঠিক আছে। তো অফিসার আর গেল না। সাত দিন পর খবর পাওয়া গেল মেয়েটির বয়স ১২ ছিল। মেয়েটির

বাবার কাছ থেকে সাংবাদিক ও মেম্বার সুবিধা গ্রহণ করে তথ্য গোপন করেছে। ততক্ষণে বরকনে অন্য জেলায়। মেয়েটির বয়সের প্রমাণ স্কুল থেকে জানা গেছে। কিন্তু সাংবাদিক ও মেম্বারের কৃতকর্মের কোনো প্রমাণ নেই!

অবাক করার মতো বিষয় হলো অনেক বাল্যবিয়ের খবরই জানা যায় না। যখন আশেপাশের সবাই মিলে বিয়েটি সংঘটিত করান তখন তা কর্তৃপক্ষের নজরে আসে না। মূলত কয়েকটি কারণে বাল্যবিয়ের খবর কর্তৃপক্ষের নজরে আসে। যারা এসব খবর প্রচার করে তারা হলো—ক) স্থানীয় বখাটে যার প্রেম প্রত্যাখ্যাত হয়েছে, খ) গত নির্বাচনে ভোট না পাওয়া মেম্বার, গ) প্রতিবেশী যার সাথে ঝগড়া, ঘ) ইতোপূর্বে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে নাকচ হওয়া পরিবার, ঙ) মেয়েটির অল্পবয়সে অসমাঞ্জস্য, কোথাও প্রেমে পড়া ও বাবা-মার কাছে ধরা খাওয়ায় প্রত্যাখ্যাত প্রেমিক এসব খবর প্রচার করে, চ) গ্রামের জমি নিয়ে, বাড়ির সীমানা নিয়ে বচসা রয়েছে এমন পরিচিত কেউ, ছ) রাজনৈতিক বা ধর্মীয় তীব্র মতভেদ থেকে ঈর্ষায় ভোগা কোনো ব্যাক্তি। ইত্যাদি। সত্যিকার অর্থে বাল্যবিয়ের কুফল থেকে বাঁচাতে কেউ ফোন করে এমনটা খুব কম ঘটে।

অফিসার খুব আতঙ্কিত হয় আরও একটি মারাত্মক সমস্যার কথা ভেবে—বাল্যবিয়ের অনেক ক্ষেত্রে নিকাহনামায় নিবন্ধন হয় না। যেহেতু মেম্বার বা চেয়ারম্যান কোনো জন্মসনদ দেন না সেহেতু কাজি বিয়ে পড়ান না। স্থানীয় মসজিদের ইমাম শরিয়া নিয়মে কবুল বলান। এতে মেয়েটির জীবন সম্পূর্ণ অনিশ্চায়তার মধ্যে পড়ে। আইনগত কোনো ভিত্তি তৈরি হয় না। এরকম একটি বিয়ে তিনমাসের মধ্যে ভেঙে যাওয়ার পর মেয়েটির বাবা অফিসারের কাছে এসছিলেন। সহযোগিতা কামনা করতে। তখন আর কী করা যায। মেয়ে, মেয়ের মা আর বাবার চোখের পানি ফেলা ছাড়া কোনো গত্যান্তর আছে কি? নিজেই নিজের জন্য খাদ বানালে তাকে কে রক্ষা করে?

অফিসারদের মধ্যেও চিন্তার তারতম্য রয়েছে। অফিসারের এক সহকর্মী ঐদিন সভাশেষে বলছিল—বাল্যবিয়ের বিষয়ে তিনি খুব কঠোর। এক বছরের নিচে কোনো কারাদণ্ড নেই। কোনো ছাড় নেই। খবর পেলেই হলো। সঙ্গে সঙ্গে হাজির। বিয়ে ভেঙে দেয়া, গ্রেফতার ও কারাদণ্ড।

অন্য অফিসার আবার বিষয়টি ভিন্নভাবে দেখেন। আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনায় তিনি চিন্তা করেন। গরিব পরিবার, মেয়ে বিয়ে দিয়ে একটু ভার

লাঘব করতে চায়। তাই হুট করে এসব বিয়ের আসরে উপস্থিত হয়ে তার বিয়ে ভাঙতে ভালো লাগে না।

অন্যজন বলেন, আইন ও বাস্তবতার মধ্যে একটা ব্যালেন্স করা দরকার। মানুষকে সচেতন করতে হবে, বোঝাতে হবে। বাল্যবিয়ের কুফল অনেক। অধিক জনসংখ্যা, মাতৃ মৃত্যুহার ও শিশুমৃত্যুহার এর সাথে সম্পৃক্ত। মাঝে মাঝে দুয়েকটা শাস্তিও হতে হবে। অফিসার নিজেও বিষয়টি নিয়ে দোদুল্যমানতায় ভোগেন। আইনি বিধান, মেয়ের পরিবারের আর্থসামাজিক অবস্থা, সমাজে বখাটেদের দৌড়াত্ম্য, কম বয়সে মা হওয়ার ফলে দীর্ঘমেয়াদী পরিণতি, বাল্যবিয়ের সাথে দেশের জনসংখ্যা, জনসম্পদ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও উন্নয়ন ইত্যাদি বিবেচনা করতে গেলে এ বিষয়ে সুক্ষ্ম ন্যায়বিচার সুদূর পরাহত।

রাত তিনটা বেজে যায়। অফিসারের আর ঘুম আসে না। সমাজবিজ্ঞানের ছাত্র এ অফিসার সমাজ বিশ্লেষণ করে কোনো কূল কিনারা পান না। সমাজবিদরা ঠিক করেছেন বাল্যবিয়ে দেশের পক্ষে অমঙ্গলজনক। এতে সন্তান দুর্বল হয়, পরিবার ভাঙে, দম্পতির কষ্টে লোনাজলে হাবুডুবু খেতে হয় ইত্যাদি। সরকারি বিধানে বাল্য বিবাহ দন্ডনীয় অপরাধ হলেও সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এ নিয়ে গোপনে অনেক মত প্রচলিত। কেউ বলে বাল্যবিয়ে ভালো কেউ বলে মন্দ, কেউ বলে উচিত কেউ বলে অনুচিত, কেউ বলে মঙ্গল, কেউ বলে অমঙ্গল। নানুদের এখনো বিশ্বাস ঋতুস্রাব শুরু হওয়ামাত্র কনের বিয়ের দেয়া উচিত।

আসলে প্রত্যেকেই নিজস্ব অবস্থান, শিক্ষা ও ধারণা নিযে উপসংহার তৈরি করে। অনেকে ধর্মীয় ব্যাখ্যা তুলে ধরেও অবস্থান নেয়। এমন ছেলেও আছে যে কিনা নিজে বাল্যবিয়ের জন্য আসামিকে গ্রেফতার ও শাস্তি প্রদানে সহযোগিতা করেছে আবার পরে নিজেই ১৮ বছরের কম বয়সী মেয়েকে বিয়ে করেছে। এমন ছেলেও আছে যে এনজিওর পক্ষ থেকে বাল্যবিয়ে সংক্রান্ত সচেতন প্রোগ্রাম করে বেড়ায় কিন্তু বাস্তবে নিজে ষোড়শীকে বিয়ে করেছে। এমন মেয়েও বিদ্যমান যে হাতধোয়া প্রোগ্রামের প্রতিনিধি হিসেবে গ্রামের সচেতন প্রোগ্রামে কাজ করতো এবং বাল্যবিয়ে নিয়ে অন্যদের সচেতন করতো। পরে শোনা গেল মেয়েটি কারো হাত ধরে রাতের আঁধারে পালিয়েছে। দুজনেই ২১/১৮ অতিক্রম করেনি। আমরা যা ঘৃণা করি অবচেতনে আবার সেইটেই ভালোবাসি। এ এক অপার লীলা। বাল্যবিয়ে মেয়েদের জন্য ভালো নয় এমন বিশ্বাসী নারী নেত্রীকে দেখা যায় যিনি বেশি বয়সী মেয়েকে নিজের ছেলেকে

দিয়ে বিয়ে করাবেন না। আপাতদৃষ্টিতে দেখলে মনে হবে আমাদের সমাজে বাল্যবিয়ে সম্পর্কে সবাই সজাগ ও সবাই সচেতন। পরিহাস হলো এই যে এ সজাগ ও সচেতনদের অনেকেই বাল্যবিয়ের প্রতি আসক্তিতে ভোগেন। তাই এ সমস্যার সমাধান অসম্ভব না হলেও কঠিন। সবসময় সবখানে সর্বাবস্থায় বাল্যবিয়ে নিষিদ্ধকরণ সঠিক কিনা সে নিয়েও অ্যাকাডেমিক আলোচনা ও গবেষণা হতে পারে। আমাদের সমাজে অনেকের মধ্যেই আনমনে এটা কাজ করে যে কমবয়সী মেয়েরা বিয়ের জন্য ভালো। অশুভ চক্রের মধ্যে সমাজ ঘুরছে। সমাজের 'সর্বাঙ্গে ব্যথা ওষুধ দিব কোথা' দশা।

৪

এরকমভাবেই দিন মাস আর বছর যায়। এক সকালে একটা খবর শুনে মনা মেম্বারের মন খুব খারাপ। গণি মিঞার মেয়েটি বাচ্চা জন্ম দিতে গিয়ে হাসপাতালে মারা গিয়েছে। গণি মিঞা ও গণি মিঞার বউ পাগলের মতো অবস্থা। রক্তশূন্যতা ও শারীরিক দুর্বলতার কারণে বাচ্চা নেয়া ও প্রসবের মতো শারীরিক অবস্থা তৈরি হয়নি মেয়েটির। হাস্যোজ্জ্বল মেয়েটির মুখ মনে পড়ে মনা মেম্বারের। মার হাত থেকে পান এনে দিয়েছিল 'একদিন। উচ্ছ্বল সেই কিশোরীটি আর বেঁচে নেই তা মনা মেম্বার আর ভাবতে পারে না। কম বয়সে বিয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে মনা মেম্বারের ভূমিকা ছিল। মনা মেম্বার গণি মিঞাকে বাধা দেয়নি। মেম্বার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেনি। মনা মেম্বারের নিজের মেয়েটি উঠানে বউচি খেলতেছে। চুলে বেণী করা দূরন্ত কিশোরী। মনা মেম্বার নিজের মেয়ের মুখে গণির মিঞার মেয়ের মুখটি দেখতে পায়। মনা মেম্বারের চোখ দিয়ে জল গড়ায়। অনুশোচনায় ভেঙে পড়ে। আল্লাহর কাছে মনে মনে মাফ চায়। হে আল্লাহ তুমি আমার মেয়েটাকে রক্ষা করো। মেয়েটা আমার জীবন।

বাতিকগ্রস্ত জীবন

আওয়াল মজুমদার সবকিছু নিজের হাতেই করে। তার বন্ধু সহকর্মীরা পিয়ন চাপরাশি ছাড়া চলতে পারে না। সরকারি অফিসে বড়কর্তা হলেও মজুমদার সাহেব নিজের মতো থাকতে পছন্দ করে। অফিসে বা বাসায় সবকিছু নিজের মতো করে নিজের হাতে করে। টুকিটাকি সব কাজ। থাকে ইস্কাটনে। বাসায় একা একাই থাকে। স্ত্রী গত হয়েছে কয়েকবছর আগে, আর সন্তানরা থাকে অন্য শহরে।

ঘরের সব কাজ নিজে করলেও কিছু ভারী কাজ এখন কাজের বুয়া করে। স্থায়ী কেউ নেই। কেবল ঘর মোছা ও কাপড় ধোয়ার জন্য খুব ভোরে একজন ঠিকে ঝি আসে। ঠিকে ঝির কাজ শেষ হলে ঠিকে ঝি বের হওয়ার সময় মজুমদার সাহেব নিজেও বের হয়। রমনায় হাঁটতে যায়।

আজকে ঠিকে ঝির কাজ শেষ হবার আগেই মজুমদার সাহেব প্রস্তুত হয়ে বসে আছে। রমনায় যাবার জন্য। ঠিকে ঝিকে রেখে রমনায় যেতে পারছে না। মজুমদার সাহেব মনে মনে ভাবছে। যদি তালা খোলা রেখে চলে যায়, ঠিকে ঝি পরে তালা লাগিয়ে চলে যেতে পারে। কিন্তু তবু মজুমদার সাহেব বের হচ্ছে না। মনে সন্দেহ যদি বুয়া চুরি করে, যদি কিছু নিয়ে যায়। কী কী নিয়ে যেতে পারে তা ভাবতে গিয়ে তেমন কিছু পেলো না মজুমদার সাহেব। বাসায় নগদ টাকা বা সোনা গয়না কিছু নেই। টিভি বা বড় আসবাব যা আছে তা নিতে পারবে না, কারণ নিচে সিসি ক্যামেরা আছে।

মানুষ এখন মানুষকে বিশ্বাস করে না। সিসি ক্যামেরাকে বিশ্বাস করে। মানুষ, মন, চোখ সবকিছুর দায়িত্ব এখন সিসি ক্যামেরাই পালন করে। মানুষের গুরুত্ব ক্রমেই কমে যাচ্ছে। সিসি ক্যামেরা যেহেতু আছে সেহেতু বুয়া কিছুই নিয়ে যেতে পারবে না। তবে পিঁয়াজ মরিচ, বা সামান্য তরকারি বা খাবার বা

এরকমই ছোটখাটো কিছু জিনিস কাপড়ের তলায় করে নিয়ে যেতে পারে। তবু মজুমদার সাহেব বের হচ্ছে না। লাঠি হাতে নিয়েছে, কেডস পরেছে, চোখে চশমা দিয়েছে। তারপর ড্রয়িং রুমে হাঁটছে আর পায়চারি করছে। বুয়ার ঘর মুছা ও কাপড় ধোয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করছে।

পাঁয়চারি করতে করতেই মজুমদার সাহেবের মনে পড়ে গেলো তার লন্ডনে থাকার সময়কার কথা। ওখানে ছুটির সময় এক বয়স্ক লোকের দেখাশোনার দায়িত্ব পালন করেছিল। এমন অনেকদিন হয়েছে যে বাড়ির মালিক তার কাছে চাবি দিয়ে চলে গেছে। সে তার কাজ শেষ করে তালা দিয়ে চাবিটি বাগানের এক জায়গায় রেখে দিতো। লন্ডনের বয়স্ক লোকটি বিদেশি এক ছোকরাকে বিশ্বাস করতে পেরেছে। সে বাঙালি হয়ে বাঙালি আরেক হাউজমেইডকে বিশ্বাস করতে পারছে না। তার খুবই খারাপ লাগছে। কিন্তু তবু সে বুয়ার কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে। বুয়া বের হবার পরে ভালো করে তালা দিলো। সেই তালা আবার কয়েকবার চেক করলো। তারপর গেলো হাঁটতে।

রমনাতে ঢোকার গেটেই কয়েকজনকে নিয়মিত পাওয়া যায়। কেউ প্রেশার মাপে, কেউ সব্জি বেচে, কেউ বনাজি ইউনানি শরবত বেচে। পিচ্ছিল পিচ্ছিল শরবত। শক্তি বাড়ায়, বলবর্ধক, কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে, প্রেশার কমায়। যার যেটা দরকার সেটা ভেবেই সে পান করে। এই লোকগুলো মার্কেটিং না পড়লেও মার্কেটিংয়ের সব জানে। সকাল বেলায় রমনাতে কারা আসে, তাদের কী কী প্রয়োজন হতে পারে, সেসব ভেবে তারা পণ্য সংগ্রহ করে ও সেবা প্রদান করে। বাজারজাতকরণের টুলস বা গবেষণা জানা নেই, কিন্তু বাস্তবিকই তারা বাজারজাতকরণের সকল তত্ত্ব বাস্তবায়ন করে। মার্কেটিংয়ের জনক ফিলিপ কটলার কিংবা বাজারজাতকরণের ওপর সর্বাধিক বাংলা বইয়ের লেখক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর মীজানুর রহমান যদি এসব দেখেন তবে তাজ্জব বনে যাবেন। কারণ তাঁদের বই না পড়েই রমনা পার্কের গেইটে বসা ব্যবসায়ীরা সব বাস্তবে করে।

মাঝে মাঝে ওজন মাপে বা প্রেশার মাপে মজুমদার সাহেব। মাপলেও ওজনের যন্ত্র ও প্রেশার মাপার যন্ত্রের ওপর কোনো আস্থা নেই তার। নিশ্চয়ই দুনম্বরী জিনিস দিয়ে কোনোরকমে বসে আছে। সন্দেহ মনে থাকলেও মাপায়। মাঝে মাঝে শরবতও খায়। জানে যে এসব শরবতে ডায়াবেটিস বা

কোষ্ঠকাঠিন্য কোনোকিছুই কমবে না, বাড়বে না শরীরের বলও। তবু খায়। সন্দেহ নিয়েই খায়। যদ্দেশে যদাচার। মিথ্যার বেশাতিতে ভাসছে দেশ। সেখানে পার্কের সামনের ফুটপাতের দোকানদারকে আর কী দোষ দেবে?

পার্কে ঢুকে তিন রাউন্ড চক্কর দেয়। এক রাউন্ডে দুই কিলো হয়, তিন রাউন্ডে ছয় কিলোমিটার হয়। মাঝে একটু পানি খায়। পানিওয়ালা ছেলেটাকে ডাক দেয়। ছেলেটাকে আগে থেকেই চেনে। নিয়মিত পানি কেনা হয় বিভিন্ন হকারের কাছ থেকে। তার মধ্যে এই ছেলেটিও আছে।

ছেলেটির নাম মনির। নাম ধরে ডাকতে ইচ্ছে করে না মজুমদার সাহেবের। এই পিচ্চি বলে ডাক দেয়। দৌড়ে আসে মনির। 'স্যার পানি লাগবে?' মনিরের আগ্রহ দেখে তার আসার দিকে চেয়ে থাকে মজুমদার সাহেব। মনে মনে ভাবে নিশ্চয়ই এ পানি অরিজিনাল না। মাম পানি বা প্রাণ কোম্পানির বোতল হলেও এগুলো অরিজিনাল নাও হতে পারে। কারণ তিনি শুনেছেন যে বোতল টোকানোর পরে এসব বোতলে পানি ভরে পুনরায় বিক্রি করা হয়। বস্তিতে বোতল পরিষ্কারের ও ছিপি লাগানোর ব্যবস্থা আছে। দুনম্বরী ব্যবসা। এসব সন্দেহ মাথায় নিয়েই মনিরের কাছ থেকে পানি কেনে। পানির বোতলটা মাম কোম্পানির কিংবা প্রাণ কোম্পানির নাকি নকল তা ভাবতে ভাবতে ঢকঢক করে কয়েক ঢোক গিলে। বিশ টাকা দিয়ে মজুমদার সাহেব হাঁটতে শুরু করে। এভাবে ছয় কিলোমিটার দৌড়ানোর পরে রমনার মাঝখানে কিছুক্ষণ স্ট্রেচিং করে। পরে চোখ বন্ধ করে ইয়োগা করার চেষ্টা করে। কিছুক্ষণ বসে বা শুয়ে থেকে। মানিব্যাগ, লাঠি পাশে রেখেই ইয়োগা করার চেষ্টা করে। তবে মানিব্যাগ ও লাঠি চুরি হয়ে যায় কিনা এ ভয় নিয়ে নিয়েই ইয়োগার কাজটি শেষ করে। ইয়োগাতে মনোযোগ দরকার হয়। কিন্তু মানিব্যাগ ও লাঠি কেউ নিয়ে যায় কিনা সেটা ভাবতে ভাবতে পূর্ণ মনোযোগে ইয়োগা করতে পারে না মজুমদার সাহেব। মনের মধ্যে একটা খচখচ নিয়েই একবার চোখ খুলে একবার তাকায় একবার বন্ধ করে। এভাবেই ইয়োগা অংশটি শেষ করে।

মর্নিংওয়াক শেষে বাসায় ফেরার পথে একটি ফার্মেসিতে প্রবেশ করে। সেখানে কিছু ওষুধ অর্ডার দেয়। দোকানদার ওষুধগুলো দেয়। মজুমদার সাহেব ওষুধগুলোকে উল্টেপাল্টে দেখে। মনে মনে সন্দেহজনক ভাবনা উদয় হয়, যে ওষুধগুলো অরিজিনাল কিনা! বাজারে নকল ওষুধে ভরে গেছে। নকল ওষুধ হলে তো ঝামেলা। যেভাবে চারদিকে ফেইক পণ্য বানানোর হিড়িক

পড়েছে, সেখানে জীবন রক্ষাকারী ওষুধে যে তা করবে না তা বলা মুশকিল। গত কয়েক মাস আগে মিটফোর্ডে ম্যাজিস্ট্রেটরা অপারেশন করে কোটি কোটি টাকার ওষুধ ও মেডিক্যাল যন্ত্রপাতি বাজেয়াপ্ত করেছে। একদিন বাজেয়াপ্ত করেছে আর হাজার দিন যে বাজারে সরবরাহ হয় সেগুলো নিশ্চয়ই মানুষ কেনে। এসব ভাবতে ভাবতেই দোকানদারকে এক হাজার টাকার নোট দেয়। দোকানদার এক হাজার টাকার নোটটি বারবার করে চেক করছে। টাকাটি জাল কিনা এ কারণে দোকানদার বারবার চেক করে ও চেঞ্জ ফেরত দেয়। শেষে মজুমদার সাহেব বাসায় রওয়ানা দেয়। কিন্তু ফিরতে ফিরতে ভাবতে থাকে, সকাল থেকে প্রতিটি বিষয়ে অন্যের ওপর বিশ্বাস না করার যে ইস্যুগুলো আসলো তা নিয়ে চিন্তিত বোধ করলেন। ঘরে বাইরে এখানে সেখানে অফিসে আদালতে সবখানে অবিশ্বাসের যে বেড়াজাল তৈরি হয়েছে তাতে মানসিক শান্তির কোনো উপায় পান না। মজুমদার সাহেব সার্বিক পরিস্থিতি চিন্তা করে ভাবনায় মগ্ন হলেন। জীবনের কতশত কাজ করে এসে এখন দেখেন মানুষ কেউ কাউকে বিশ্বাস করছে না। এত বেশি পরিমাণ জালিয়াতি ও ভোগদখল হয়েছে যে সাধারণ মানুষ হিসেবে তিনিও এখন কাউকে বিশ্বাস করতে পারছেন না। অবিশ্বাসের যে আবরণ মজুমদার সাহেবের মনে পড়েছে তা খুলে ফেলা বা জিরো করে তোলা কঠিন। মানুষ এখন নিজের পরিবারের সদস্যদেরকেও বিশ্বাস করাতে পারছে না।

২

কী জানি কী কারণে মজুমদার সাহেব পার্ক থেকে ফিরে বেডরুমে বিছানায় শুয়েছিল। একটি পিঁপড়া তার হাত বেয়ে ওপরে উঠছে। সুরসুরি লাগছে। কিন্তু চোখ খুলতে ইচ্ছে হলো না। পিঁপড়াটি হাত বেয়ে কাঁধ বেয়ে তার কান ও গাল পেরিয়ে নাকের দিকে যাচ্ছে। হাত তুলে পিঁপড়াটিকে সরানোর মতো অবস্থায় ছিল না। ক্লান্তি আর আলসেমিতে চোখ বন্ধ করে লাশের মতো শুয়ে থাকলো। কিংবা ঘুমিয়ে গেলো। এমন একটা তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থার মধ্যে চলে গিয়েছে। পিঁপড়াটি নাকের ভেতরে ঢুকে তাঁর শ্বাসের গরমের কারণে হোক আর ভেতরের অন্ধকার দেখে হোক বেরিয়ে গেলো। তিনি আধো জাগরণ ও

আধো ঘুমে স্বপ্নে চলে গেলো।

পিঁপড়াটি বসে নেই। তাঁর নাক থেকে বেরিয়ে আবার কাঁধ ও হাত বেয়ে বিছানা বেয়ে মাটিতে নেমে গেলো। পাশেই নামাজের বিছানা বিছানো। সেটা পেরিয়ে রুমের দরজা দিয়ে টয়লেটে ঢুকলো। কমোড বেয়ে ভেতরে নেমে গেলো। মজুমদার সাহেব হয়তো বাথরুম করে ফ্ল্যাশ করতে ভুলে গিয়েছে। পিঁপড়াটি সেই বিষ্ঠার উপর দিয়ে চলে গেলো অন্য পাশে। মাঝে একবার থামলেও মনে হলো খাবার হিসেবে পছন্দ করলো না। চারতলা থেকে নামতে নামতে চলে গেলো একেবারে নিচে।

সেখান থেকে পাশের বাড়ি গিয়ে ওই বাড়ির বাগান পেরিয়ে পাশেই মসজিদে চলে গেলো। মসজিদের ফ্লোর পেরিয়ে মিম্বরের পাশে তাকে রাখা কুরআন শরিফের ওপরে গিয়ে বসলো। বসে দাঁত দিয়ে কাটার চেষ্টা করলো। কিন্তু মনে হয় পারলো না। কিংবা অস্থির স্বভাবের এ পিঁপড়াটি চলে গেলো অন্যকাজে।

মসজিদ থেকে বেরিয়ে দুদিন চলতে চলতে পাশেই থাকা এক হিন্দু বাড়িতে ঢুকলো। সেখানো পুজোর জন্য সাজিয়ে রাখা ফুলগুলোতে গিয়ে উঠলো। ফুলের গন্ধে মাতোয়ারা হয়ে পিঁপড়াটি কিছুক্ষণ নাচানাচিও করলো। সেখান থেকে নেমে পিঁপড়াটি চলতে শুরু করলো। কয়েকবাড়ি পেরিয়ে এক মন্দিরে ঢুকলো। পুরোহিতের পা বেয়ে শরীর পেরিয়ে ঘাড় বেয়ে কপালের তিলকে গিয়ে বসলো। নিজেকে থামিয়ে রাখতে পারে না পিঁপড়া। সে নেমে আসলো। মন্দিরের প্রতিমার শরীর বেয়ে উঠতে লাগলো। উঠতে উঠতে মাথার চুলে গিয়ে হারিয়ে গেলো। চুলের গহীনে ঘণ্টা দুই একটু জিরিয়ে সে নেমে এল নিচে। নিচেই পেলো গীতা, বেদ ও মহাভারত। সব বইয়ে একটু একটু করে চড়ে নিল। ঘ্রাণ নিলো।

সেখান থেকে আবার হাঁটতে শুরু করলো। কয়েক মহল্লা পেরিয়ে তিন দিন তিন রাত পরে পাশের এক গির্জাতে গিয়ে ঢুকলো। গির্জার ঘণ্টার আওয়াজে আওয়াজে নাচতে নাচতে পিঁপড়াটি গিয়ে উঠলো যিশুর ক্রসে।

এসব ঘটনা তন্দ্রায় আচ্ছন্ন মজুমদার সাহেব দেখলেন। আর বাস্তবে হয়তো দেখলেন রাম, রহিম ও পল। মানুষের বিষ্ঠা খেয়ে আসা বিধর্মী স্থান, বস্তু ও চিহ্ন বেয়ে আসা পিঁপড়াটির প্রতি ক্রোধ জন্মালো এ তিন জনের। তিনজনেই পিঁপড়াটিকে মারতে উদ্যত হলো। এবং মেরে হত্যা করলো। পা দিয়ে ভর্তা

বানিয়ে মেরে ফেলা নিশ্চিত করলো।

তিনজনেই স্বর্গ বা বেহেশত নিশ্চিত হয়ে খুশিমনে নিজেদের বাড়ি গেলো। গিয়ে পরমানন্দে সুখে শান্তিতে বসবাস করতে লাগলো।

আর এদিকে পিঁপড়াটির আত্মা হাসতে হাসতে চলে গেলো বেহেশতে, স্বর্গে। আর মানুষের বিষ্ঠা, রহিম, রাম, ও পল ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও পুস্তকগুলোর দাবিদাররা রয়ে গেলো পৃথিবী নামক জাহান্নামে।

এসব স্বপ্ন দেখতে দেখতেই আওয়াল মজুমদার ঘুমে আচ্ছন্ন। তখনই বাসায় নক করে প্রতিবেশী হারুন। হারুনের কলিংবেলের রিংয়ে ঘুম ভাঙে। মজুমদার সাহেব বুঝতে পারে যে পিঁপড়াকে দেখছিল স্বপ্নেই। স্বপ্ন হলেও বাস্তবই মনে হলো। মজুমদার সাহেব ঘুম ঘুম চোখের আয়েশে থেকেই ভাবতে থাকে। পিঁপড়া নামক প্রাণীটি সকল ধর্মের পথ ও ধর্মগ্রন্থ স্পর্শ করে সুখেই জ্ঞানের রাজ্যে ও বিশ্বাসের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারলেও মানুষ পারে না। মজুমদার সাহেব পারে না। মানুষের মধ্যে বিভাজনের যে সংস্কৃতি আর অন্যদেরকে অবিশ্বাস ও অবহেলা করার যে সংস্কৃতি তা অন্য কোনো প্রাণীতে নেই বলে মজুমদার সাহেব সিদ্ধান্তে পৌঁছান।

কলিং বেল আবারও বাজছে। দরজার খোলার আগে দরজার ফুটো দিয়ে দেখতে চেষ্টা করে কে এলো। দেখা যায় প্রতিবেশী হারুন। মজুমদার সাহেব দরজা খুলতে ইতস্তত করছে। সকাল সকাল হারুন কেন হাজির তা ভেবে পাচ্ছে না। নিশ্চয়ই টাকা ধার চাইতে এসছে। একবার তিনলাখ টাকা ধার নিয়ে তিন বছর ঘুরিয়ে দিয়েছে। আজ আবার কোন মতলব নিয়ে এসছে কে জানে! সন্দেহ ও উদ্বেগ নিয়েই দরজা খুললো। হারুন বিগলিত হাসিতে সালাম দিলো। আসসালামু আলাইকুম। মজুমদার সাহেব ওয়ালাইকুম বলে বিরক্তি নিয়ে তাকালো হারুনের দিকে। হারুন একটি প্যাকেট বের করে দেয়। বলে, রাঙামাটি ঘুরতে গিয়েছিলাম। ওখান থেকে পাহাড়ি কলা ও পেঁপে নিয়ে আসছি আপনার জন্য। মজুমদার সাহেব অবাক হয়। মনে মনে কিছুটা লজ্জাও পায়। লজ্জা ও বিব্রতভাব লুকিয়ে তিনি হাসিমুখে প্যাকেটটি তার কাছ থেকে নেন।

হারুন সাহেব বসেন না। বাসায়ও ঢোকেন না। আবারও সালাম দিয়ে চলে যান। মজুমদার সাহেব কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন। তার মনে সন্দেহ রোগটি বেশি দানা বেঁধেছে। তার কারণ খুঁজতে থাকলেন। পত্রিকা নিয়মিত পড়েন

তিনি। পত্রিকায় সব নেতিবাচক নিউজ। স্বার্থের রাজনীতি, প্রতারণার খবর, খাদ্য ও পরিবেশ নিয়ে যতসব নেতিবাচক নিউজ ও নৈতিক অবক্ষয়ের খবর পড়তে পড়তে মাথায় সব সেট হয়ে গেছে। এখন যাকে পায় তাকেই সন্দেহ লাগে। এটা মনে হয় রোগে পরিণত হয়েছে। ডাক্তার দেখাতে হবে। স্বপ্নে কি সব পিঁপড়ার হাঁটাহাঁটি দেখলো। এটা নিয়েও মজুমদার সাহেব অস্বস্তিতে আছে। ডাক্তার কাকে দেখাবে ভেবে পাচ্ছে না। ডাক্তাররাও তো আজকাল নকল। ডাক্তার না হয় খোঁজ করে অরিজিনাল ডিগ্রিধারী ও পদধারীর কাছে যাওয়া যাবে। কিন্তু ডাক্তারের যে নৈতিক অবক্ষয় হয়ে পেশাদারিত্ব হারিয়ে হায়েনা ব্যবসায়ীতে রূপ নেয়নি সেটা বোঝা মুশকিল। কারণ সমাজের অন্য সব শ্রেণির মতো ডাক্তারি, শিক্ষকতা ও সাংবাদিকতা এ তিন পেশাতেও অবনতি দৃশ্যমান।

মজুমদার সাহেব পণ করেন। ভুয়া ডাক্তার বা ব্যবসায়ী ডাক্তার দেখানো বা নকল ওষুধ খাওয়ার চেয়ে ডাক্তার না দেখানোই ভালো। যা হবার হবে। দরজাটা দরাম করে লাগিয়ে তিনি বাথরুমে ঢুকেন গোসল করার জন্য। গোসলে সারা শরীর ফেনাফেনা করে সাবান দিয়ে ডলে পরিস্কার করেন।

মনে মনে ভাবেন যেভাবে শরীরের চামড়াটা পরিষ্কার করতে পারছেন, সেভাবে যদি নিজের মন, চিন্তা ও কর্মপরিকল্পনাগুলো পরিস্কার করা যেতো, সকল সন্দেহ দূর করা যেতো, তবে কতই না ভালো হতো!

এক আনার জীবনের বাহাদুরি

অনেকদিন পর বুড়ী নদীর পারের গ্রামে আসলো সোহেল। তাদের বাড়ির পাশেই ব্যস্ত সড়ক। সড়ক পেরোলেই বিশাল প্রান্তর। প্রান্তর আর সড়কের মাঝে একটি ছোট পুল রয়েছে। পুলের রেলিংয়ে বসে প্রান্তরের সবুজ দৃশ্য দেখতে খুব ভালো লাগে তার। তাই গ্রামে আসলেই সোহেল এখানে আসে। পুলের রেলিংয়ে বসে। ধু ধু প্রান্তরের অবারিত সবুজ দৃশ্য সে দেখে। কৈশোরের দূরন্তপনার অনেক ছবি সে দেখতে পায় এখানে বসেই। একটার পর একটা দৃশ্য তার চোখের সামনে ভাসে। ব্যস্ত সড়কে মানুষের হাঁটাচলা আর যানবাহনের আওয়াজ তার চিন্তায় কোনো ব্যঘাত ঘটাতে পারে না। সুখস্মৃতির আবেশে এতটাই মগ্ন থাকে যে এসব তার কর্ণকুহরে প্রবেশ করে না। ভাবতে ভাবতে সে হারিয়ে যায় স্বপ্নের আবেশে, গড়ে তোলে স্বপ্নের দেশ, স্বপ্নের শহর। আবার দুঃখ জাগানিয়া স্মৃতি মনে করে করে সে কেঁদে ভিজিয়ে ফেলে কপোল।

কী সোহেল মিয়া বাড়িতে কবে আইলা? হঠাৎ একটি ডাকে সে নড়েচড়ে বসে। ঘাড় ঘুরিয়ে সে দেখতে পায়, গ্রামের মাতব্বর সাব আসছেন। গ্রামের মাথা বলে নিজেকে দাবি করে, লোকদেরকেও বলতে বাধ্য করায়, গ্রামের তথা আশেপাশের সালিশ দরবার তার হাতে। সালিশ মানেই অনেক প্যাঁচের খেলা, জিলাপির থাকে আড়াই প্যাঁচ, আর মাতবরদের থাকে সাড়ে বারো প্যাঁচ। আসমানের আছে সাত স্তর, আর সালিশের থাকে সাত-সাতা উনপঞ্চাশ স্তর। সব স্তরে ঘটনা সাজিয়ে, সব প্যাঁচ কষিয়ে সালিশ সাজায়। সালিশ ব্যবসার অনেক লাভ। ক্ষমতা পোক্ত হয়, পকেটও ভারী হয়।

এই সেই মাতব্বর যাকে ছোটবেলায় একটি মারামারিতে দেখেছিল।

দুপাশে দু গ্রাম। মাঝখানে সবুজ প্রান্তর। সবার হাতে বল্লম, মুলি (বাঁশের ধারালো কঞ্চি), রামদা, ইট ইত্যাদি দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে। একপক্ষ আরেকপক্ষকে এলোপাতারি নিক্ষেপ করছে। সোহেল দূর থেকে দেখছিল। পাশে এই মাতব্বর। তিনি চিৎকার করে বলছেন, 'গ্রামের মান বাঁচাও, গ্রামের মান বাঁচাও।' আর এ চিৎকারে গ্রামের জওয়ানদের গ্রামপ্রেম উথলে ওঠে আর ঝাঁপিয়ে পড়ে!

রাষ্ট্র পর্যায়ে 'জাতীয়তাবাদ' যেমন ট্রাম্প বুশরা ব্যবহার করেন, গ্রাম পর্যায়ে 'গ্রামের মান বাঁচাও, গোষ্ঠীর মান বাঁচাও' নামক গ্রামপ্রেম/গোষ্ঠীপ্রেমের/ ধর্মপ্রেমের চরম অপব্যবহার হয়। সেই ছোটবেলায় সোহেল বুঝেছিল যে মাতব্বর ভুল বলছেন। এই মাতব্বর চিৎকার করছেন। তিনি চুল পাকিয়ে ফেললেও বুঝতে শেখেননি মানবপ্রেম বাদ দিলে গ্রামপ্রেম থাকে না, মানুষের মান না থাকলে গ্রামের মান থাকে না।

গ্রামের মানুষগুলো একসাথেই চলাফেরা করে। একসাথেই দশকের পর দশক মিলেমিশে চলে। বিয়ে খতনা একসাথে খায়। বাজারে যায়, বিলে কাজ করে, ঈদের মাঠে কুলাকুলি করে, শুক্রবারের জুম্মায় খুতবা শোনে, শীতকালের মাহফিলে হুজুরের ওয়াজ শোনে, পাশাপাশি বসে গাল ভিজিয়ে অশ্রু ফেলে। কীভাবে সম্ভব মেরে ফেলা! সোহেল ভেবেই পায় না। সোহেল ভেবে না পেলেও মাতব্বররা তাদের স্বার্থে মানুষের মাঝে ঝগড়া লাগিয়ে রাখে। যত জমি জমার ঝামেলা, যত মারামারি, যত মামলা মোকাদ্দমা, তত মাতব্বরদের লাভ।

সেই মাতবর ধীরে ধীরে হেঁটে আসছে আজ সোহেলের দিকে। সোহেল যে ব্রিজের উপর বসা সেখান দিয়েই যাচ্ছে। হাতে সিগারেট। মুখ দিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। বয়স ষাটের কোটায়। প্রৌঢ় চেহারায় অভিজ্ঞতার ছাপ স্পষ্ট।

: স্লামালেকুম চাচা কেমন আছেন?

: ভালো। বলে একটু অন্যদিকে তাকান। একটু দম নিয়ে মুখের অভিব্যাক্তিটায় একটা ভাব আনার চেষ্টা করেন। তা কখন আইলা? গ্রামে তো আসোই না!বলেই চোখ দুটো কুচকে মুখটা গোল আর বাঁকা করে সিগারেটে টান দেন। লম্বা টান।

: জ্বী চাচা। গতকাল আসছি। আজকে আছি। কাল চলে যাবো।

: মুখ দিয়ে ধোয়া ছাড়তে ছাড়তে বলে যান। আরে কাল চলে গেলেই

হবে নাকি? থাকো। তোমরা গ্রামে এলে ভালো লাগে। তোমরাই তো গ্রামের ভবিষ্যৎ।

: জ্বি চাচা। গ্রামে আসলে আমারও ভালো লাগে। কিন্তু কী করবো ছুটি নেই, তাই!

: তা ঠিক আছে। মন্নানের ছেলে রহমত তো গ্রামে আসেই না। সে নাকি বুয়েট না ফুয়েটে পড়েছে। শুনলাম সে এখন বড় অফিসার হইসে। তার বাবার তো কোনো পড়াশোনা নেই। গরীব কৃষক ছিল। জমিজমা ছিল না। খাওয়া-পরার খুব কষ্ট ছিল। অভাবের মধ্যেই দিন পার করেছে। বংশ বড় বিষয়। বুঝলা? বংশ নিচু হলে যা হয় আর কি। বলেই মাতব্বর সাব কপালের ভাঁজগুলোকে ওপরে তুলে চোখের কীরকম একটা খেলা দেখালো।

সোহেল বুঝতে পারে, ইচ্ছাকৃতভাবে মাতব্বর সাব রহমতকে হেয় করার জন্যই এগুলি বলছেন। রহমতের বাবা কৃষক ও আর্থিক সঙ্গতি ভালো ছিল না, তা ঠিক আছে। কিন্তু ওর দাদা পরদাদাদের অনেক প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল গ্রামে, সে কথাটা বেমালুম গোপন করে যাচ্ছে মাতব্বর। সোহেল সব বুঝতে পারে। তবুও দাঁতে দাঁত চেপে বলে। চাচা বংশ নিচুর বিষয়টি বুঝলাম না!

: আরে বুঝলানা? গোবরে পদ্মফুল আর কি! বলে মাতব্বর সাব আবার সিগারেটে টান দিল। ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে রহমতের পারিবারিক শত বিষয় টেনে বানিয়ে বানিয়ে বলতে থাকলেন।অযাচিত ও অপ্রাসাঙ্গিক সব কথা।

: সোহেলের রাগ উঠছে। আর কোনো কথা কানে যাচ্ছে না। মনে মনে ভাবছে, আপনি তো মাতব্বর। আপনার পড়াশোনা কতটুকু? আপনার বাবা কী ছিলেন, আপনার দাদা কী ছিলেন সে খবর মনে আছে কি? নিজের ছেলে দুইটা যে পড়াশোনায় আগাতে পারেনি, গাঁজা মদ খায় সেদিকে খেয়াল আছে? কিন্তু সরাসরি কিছু না বলে শুধু বললো। চাচা, যদি কিছু মনে না করেন। কিছু কথা বলবো? মানে একটু সময় লাগবে। এ ধরেন দুই মিনিট।

: না না অসুবিধা কী! বল বল, তোমরা পড়াশোনা করছো। তোমাদের কথা শুনতে ভালোই লাগে।

: সোহেল বলতে শুরু করলো। ১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হয়েছে। এর আগে কোন গ্রামে কোন কোন পরিবার ছিল তা সকলের জানা। ১৯৪৭ সালের দেশ ভাগের আগে পরে কে কে কোন গ্রামে এসছে তাও সবাই জানে। হিন্দুদের দেশ ত্যাগের সময় কে কার সম্পদ কীভাবে দখলে নিয়েছে সেটাও

জানা। মুক্তিযুদ্ধের সময় কার অবস্থান কি ছিল সেটাও নিশ্চয়ই আপনার ভুলে যাওয়ার কথা নয়। কোন গ্রামের কোন পরিবার আগে আসছে আর কোন পরিবার পরে এসছে সেটা খুব বেশি পুরনো ইতিহাস নয়। সুতরাং অন্যের খুঁত ধরার আগে নিজের ন্যাংটি শুকনা কিনা একটু দেখে নেয়ার দরকার আছে বলে আমার ধারণা।

: মাতবরের চেহারাটা পরিবর্তন হয়। ভ্রু কুচকে সোহেলের দিকে তাকায়। হাত উঁচু করে সোহেলকে থামতে ঈশারা করার চেষ্টা করে।

: সোহেল থামে না। গলার স্বর কিছুটা উচুতে ওঠে বরং। একাধারে বলে যায়। তাছাড়া ১৯৫০ সালের আগে বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ত্ব আইন ছিল না। তার মানে কোনো জমির মালিক কোনো ব্যক্তি ছিল না। সকল ভূমির মালিক ছিল সরকার। ১৯৫০ সালের পর সাধারণ মানুষ জমির মালিকানা লাভ করে। যদি ভূমি দিয়ে মানুষের স্ট্যাটাস ভাবেন তবে তো ১৯৫০ সালের আগে মানুষের কোনো নিজস্ব জমি ছিল না। যারা মুগল আমলের জমিদার বা ব্রিটিশ আমলের চৌধুরী ছিল, বিভিন্ন এলাকার জমি তাদের আয়ত্ত্বে ছিল। তারা ব্রিটিশ শাসনামলে ইংরেজদের তোষামোদ করতো আর বিনিময়ে রাজস্বের একটি অংশ পেত। ইতিহাসে অনেকেই এসব জমিদার বা টাইটেলধারীদেরকে ইংরেজদের দালাল বলে চিহ্নিত করেছেন। এসব জমিদারদের অনেকেই জাতভাই বাঙালির ওপর অনেক জুলুম অত্যাচার নির্যাতন করেছেন। জাতভাই বাঙালির রক্তচোষে জমিদার বাড়ির দালান হয়েছে, শান বাধানো ঘাট হয়েছে, জৌলুস হয়েছে, তেলতেলে ঘোড়া হাঁকাইছে। আরও কত কী।

যদি ১০০ বছর আগে চিন্তা করি। কোন গ্রামের কে কোথা থেকে এসছে আর কার কত জমি ছিল তাতো অজানা থাকবে না। ১৭৭৬ এর মন্বন্তর, ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ, ১৯৭৪ সালে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে না খেয়ে থাকা এগুলি বিবেচনায় নিলে তো গ্রামের কাউকে দেখি না যিনি আহামরি কিছু ছিলেন। ২০০ বছরের ব্রিটিশ শাসন, ৭০০ বছরের মুসলিম শাসন বিবেচনায় নিলে তো ধর্মটাও কি ছিল সেটাও গবেষণা করে বের করতে হবে। তবে হ্যাঁ এসব জোয়ার-ভাটায় অনেকেই সুযোগ নিয়েছেন। যেটুকু বড় হয়েছে অনেকে তা সবারই জানা। হিন্দু শাসনামলে হিন্দুদের দাপট, ব্রিটিশ আমলে ইংরেজ তোষামোদ, বাঙালির রক্ত চোষা, মুসলিম শাসনামলে মুসলমানদের অত্যাচার, ১৯৪৫ সালের পরবর্তী কালে হিন্দু সম্পত্তি অবৈধ দখল, ১৯৭১ থেকে অদ্যাবধি

রিলিফ চুরি, গম চুরি, ঠিকাদারির জোচ্চুরি, ইত্যাদির মাধ্যমে অনেকেই আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে। এবং এরাই ধরাকে সরাজ্ঞান করে নিজেকে ভদ্রলোক আর বাদবাকি সবাইকে গোবরে পোকা ভাবেন।

অন্যের বিষয়ে প্রশ্ন তোলার আগে নিজের বিষয়ে নিজেকে প্রশ্ন করি। আমাদের উচিত আয়নায় মুখ দেখা। কাচের আয়নায় নয়, নিজের মনের আয়নায়। নিজেকে জানি। নো দাইসেলফ।

মাতব্বর সাবের চেহারাটা কালো হয়ে যায়। কিন্তু পাকা মাতব্বর। হঠাৎ করে হা হা হা করে হাসতে থাকে। হাসি থামতেই চায় না। হাসির মধ্যেই বলতে থাকে। দুকলম শিক্ষা দেখি তোমার ভালোই মুখ ছুটেছে। মুখে কথার খই ফুটছে। হাত থেকে সিগারেটের শেষ অংশটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে হাটা শুরু করে। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলে আমার তাড়া আছে। সালিশ আছে, বাজারে যাওয়া লাগবে। ভাতিজা ভালো থেকো। আমার জন্য দোয়া করো। শরীরটা কয়দিন ধরে ভালো যাচ্ছে না, বলেই হনহন করে চলে গেল। সোহেলের উত্তর শোনার অপেক্ষায় থাকল না।

সোহেল বসে বসে ভাবতে থাকে। মেজাজটা গরম করা মনে হয় ঠিক হয়নি। বিষয়টা অন্যভাবেও বলা যেত। 'গুণেই মানুষের পরিচয়', 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই', 'মানুষ মানুষের জন্য', 'অর্থসম্পদ দিয়ে মানুষের মানুষত্ব যাচাই হয় না', বিশ্বের অনেক বড় বড় নেতা বিজ্ঞানীর ভুরি ভুরি উদাহরণও দেয়া যেত যাদের বাবা-মার আর্থিক সঙ্গতি ভালো ছিল না। বলা যেতো যে এক আনার জীবন। এ তুচ্ছ জীবন নিয়ে এত বাড়াবাড়ির কিছু নেই। কিন্তু এসব নীতিকথায় মাতব্বরের মাথায় ঢুকতো না। তাই একতরফা কথাগুলো বলা। পাশেই ব্রিজের নিচে খড়জাল দিয়ে মাছ ধরছে মনির। তার দাদা ছিলেন এ এলাকার অন্যতম প্রভাবশালী ব্যক্তি। অথচ আজ তাকে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করতে হয়। আইয়ুব বাচ্চুর গানটি একেবারে মিথ্যা নয়—'এক পুরুষে গড়ে ধন আরেক পুরুষ খায়, আরেক পুরুষ এসে দেখে খাবার কিছু নাই। আমার তিনপুরুষ।' তাই মনিরের কপালে শিক্ষাও জোটেনি, তথাকথিত সমাজের তথাকথিত ভালো পেশার কাজও পায়নি। নরওয়ের জেলেরা কত ধনী হতে পারে তা বাংলাদেশের মাতব্বররা কল্পনাও করতে পারবে না। সোহেলের মায়ের দুটো প্রবাদ মনে পড়লো। 'দুইদিনের বৈরাগী ভাতেরে কয় অন্ন' আর 'জাতে ভাতে কুমারের ঝি/ পাতিল দেখে

বলে এটা আবার কী?' মাতবরের মতো অনেকেই আছে অন্যদের নিয়ে চট করে মন্তব্য করে। মন্তব্যের আগে নিজের গভীরতা মাপে না। নিজের ছায়া নিজেকে দেখতে পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে হলে চিন্তায়, ধ্যানে, জানায়, ও বিবেচনায় অনেক বড় হওয়া লাগে। মাতব্বরদের এত সময় কই? লালসালু উপন্যাসের আব্দুল মজিদের মতো 'তোমার দাড়ি কই মিয়া' টাইপ ধমক দিয়ে মূল ঘটনা আড়াল করে সালিশ করে। এতেই দিন গুজার আর রুজি রোজগার।

বাস্তবের রূপকথা

বাচ্চাদেরকে প্রতিদিন গল্প বলতে বলতে ঘুম পাড়ায় জালাল। বাচ্চারাও গল্প শুনতে ভালোবাসে। মাঝে মাঝে শরীর কাহিল লাগলে গল্প বলার মুড থাকে না। তখন জালাল বাচ্চাদেরকে তাদের মায়ের কাছে পাঠায়। কিন্তু বাচ্চাদের সোজা কথা। তারা মায়ের কাছে গল্প শুনবে না। বাবার কাছেই শুনবে। কী আর করা। বাচ্চাদের বায়নার কাছে জালালের সমর্পণ করতে হয়। গল্প শুরু করতে হয়। জালাল গল্প ধরে। অনেক আগে এক দেশে ছিল এক রাজা। মেয়ে বলে, 'বাবা, তুমি শুধু অনেক আগের গল্প বলো কেন?, বর্তমানের গল্প বলো। আর রূপকথার গল্প আর বলোনা, বাস্তব গল্প বলো।' এদিকে ছেলে বলে, 'না বাবা, তুমি অনেক আগের গল্পই বলো, রূপকথার গল্পই বলো। বাস্তব গল্প বলার দরকার নেই।' শুরু হয়ে যায় ভাই বোনের মধ্যে মারামারি। দুজনের খুনসুটি জালাল কিছুক্ষণ উপভোগ করে। পরে রেফারির ভূমিকা নেয়। পকেট থেকে কয়েন বের করে লেজ-মাথা টস বেছে নিতে বলে। টসে হেরে যায় ছেলে। মুখ গোমড়া করে বসে থাকে। মেয়ে খুব খুশি। বর্তমানের গল্প ও বাস্তব গল্প শুনবে বলে।

জালাল বর্তমানের গল্প কোনটা বলবে খুঁজে পায় না। মাথায় কত ঘটনা কিন্তু বাচ্চাদের উপযোগী কোনো গল্প আছে কিনা, বা থাকলে কোনটা আছে, ভেবে পায়না। বাচ্চারা এখন বড় হয়েছে। যা বলবে হয়তো তাই বুঝবে ভেবে একটি গল্প ধরলো জালাল। ঠিক আছে, আজ তোমাদের রূপকথার অবাস্তব গল্প বলবো না। তবে বাস্তব এক গল্প বলবো যা রূপকথার মতোই।

অনেক কাল আগে নয়, কিছুকাল আগে, এই সেদিনের কথা। যখন আমরা ছোট ছিলাম তখনকার কথা। মেয়ে খুশি হয়। বলে, 'তোমাদের ছোটবেলার কথা শুনতে আমার ভালো লাগে।' জালাল থেমে যায়। বলে গল্পের মাঝখানে

কথা বললে গল্প থেমে যাবে। কোনো কথা চলবে না। শুধু 'তারপর' বলা যাবে। মেয়ে মাথা নেড়ে সায় দেয়। ছেলে মন খারাপ করে মুখ লুকিয়ে শুয়ে আছে। কিন্তু কান খাড়া করে আছে যেন গল্প মিস না হয়।

জালাল আবার শুরু করে। আমরা যখন ছোট্ ছিলাম তখনকার কথা। রাত পোহালেই হাজার হাজার পাখি কিচিরমিচির ডাকতো। পাখিদের ডাকে আমাদের ঘুম ভাঙতো। হাজার পাখির আওয়াজে কোনটা কোন পাখির আওয়াজ তা ঠাহর করা যেতো না। কিন্তু সবগুলো মিলে একটা চমৎকার ছন্দ তৈরি হতো। আমরা ঘুম ঘুম চোখে সেসব পাখির কলরব শুনতাম। ঘুম ভেঙে চোখ মুছতে মুছতে পুকুর ঘাটে যেতাম। স্বচ্ছ পানিতে শান বাঁধানো ঘাটে বসতাম। কয়লা দিয়ে দাঁত মাজতাম, আর মুখ ধুতাম। ঘাটের পানিতে আমাদের মুখ স্পষ্ট দেখা যেতো। ঘাটে বসে পুকুর পাড়ের গাছগুলো দেখতাম। পাখিদের বিষ্ঠায় গাছের অনেক পাতা সাদা হয়ে থাকতো। সবুজ সাদায় মিলে আনকোরা হাতের ড্রয়িং মনে হতো।

মুখ ধুয়ে আমরা মক্তবে যেতাম পড়তে। ভোরের কুয়াশায় আধা অন্ধকার ঠেলে আমরা মক্তবে যেতাম। আসা যাওয়ার পথে গাব গাছের নিচে বা বটগাছের তলে ভুতের ভয় করতো। ভয় করতো ঠিক কিন্তু কখনো কাউকে ভূতে ধরেছে এমনটা কেউ শোনেনি। তবে অনেকে ভয় পেয়েছে বা অ্যানেমিয়ায় আক্রান্ত মানুষকে জিনে ধরা রোগী বলে আখ্যায়িত করেছে। কবিরাজ বা মৌলভীর কাছে নিয়ে গেছে। কবিরাজ বা মৌলভী বা পীর সাহেবরা এটাকে পুঁজি করে ভালোই মজমা জমাতেন। গাঁজাখুরি গল্প আর বিশ্বাসের আড়ালে চলতো ব্যবসা।

মক্তবে পড়তে গেলে হুজুর খুব যত্ন করে পড়াতেন। কোনো হুজুর কারো সাথে কোনো মন্দ আচরণ করেছেন এমনটা হয়নি। কেউ আরবি অক্ষর শিখতো, কেউ আমপাড়া পড়তো কেউ কুরান শরিফ। এক ধাপ থেকে অন্য ধাপে গেলে সবাইকে খই খাওয়াতে হতো, কিংবা মিষ্টি জিলাপি। হাত পেতে পেতে খই বা জিলাপি নিতে আমাদের খুব আনন্দ হতো। কোনো অন্যায় করলে বা পড়ায় ফাঁকি দিলে হুজুর বেত দিয়ে মারতেন। সেই বেত খেয়ে কাঁদতাম। কিন্তু কোনদিন বাবা-মাকে বলিনি। কারণ, বাবা-মা জানতো যে হুজুর বিনাকারণে মারবে না। বাড়িতে বললে উল্টো নিজেই পুনর্বার মার খাওয়ার সম্ভাবনা শতভাগ।

মক্তব থেকে এসে ঘরে যা থাকতো তাই খেয়ে ছুটতাম স্কুলে। স্কুলে ছিল অনেক দূরে। যাওয়ার পথে অনেক মজার ঘটনা ঘটতো। কেউ গাছে উঠে পাখির ছানা ধরতো, কেউ সাঁকো থেকে পড়ে যেতো, কেউ বা কারো গাছের বরই চুরি করতো, অন্যকেউ কেউ আমগাছে ঢিল দিতো, কেউ মিষ্টি আলু জমি থেকে তুলে পকেটে ঢোকাতো। আসা যাওয়ার পথে হেন কোনো দুষ্টুমি নেই যে আমরা করিনি।

ছেলে প্রশ্ন করে, তোমরা ভয় পেতে না? আর না বলে নেওয়া তো অন্যায়। ছেলের মন ভালো হয়ে গেছে আর গল্পে মন দিয়েছে দেখে জালাল হেসে ওঠে। কিন্তু জবাব দেয় না। বলে গল্পের মাঝে কোনো প্রশ্ন চলবে না। শুধু বলতে পারবে 'তারপর'।

জালাল আবার বলে যায়, স্কুলে গেলে শিক্ষকরা খুব আদর করতো। আমরা কী করি না করি সব জানতো, আমাদের বাবা-মা কী করেন, কার বাড়িতে কী কী সুবিধা অসুবিধা সব শিক্ষকরা জানতো। ক্লাসে মন খারাপ থাকলে খেয়াল করতেন। নিজের বাচ্চার মতো আদর করতেন। ক্লাসে মন দিয়ে পড়াতেন। কোনো বিষয় না বুঝলে বুঝিয়ে দিতেন। মাঝে মাঝে বাড়িতে এসে পড়ার পরিবেশ দেখে যেতেন। মা-বাবার কাছ থেকে খবর নিতেন। স্কুলে না গেলে খবর নিতেন। অসুস্থ হলে দেখতে আসতেন। দুষ্টুমি করলে শিক্ষকরা ইচ্ছামতো মাইর দিতেন। এ নিয়ে বাবা-মায়ের কোনো অভিযোগ ছিল না। বরং বাবা-মায়েরা শিক্ষককে বলতেন যে, 'ছেলেকে দিয়ে গেলাম। শরীরের সব মাংস আপনার আর হাড্ডিগুলো আমার। দুষ্টুমি করলে আর পড়া না করলে পিটিয়ে সব মাংস ফেলে হাড্ডিগুলো বাড়িতে দিয়ে আসবেন।' তাই বলে শিক্ষকরা বিনা কারণে মারতো না। আদরই করতো বেশি। প্রয়োজনে বেত্রাঘাত করতেন। মানুষ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতেন।

স্কুল থেকে বিকেলে ফিরে মা যাই রান্না করতেন তাই খেতাম। এটা খাবো না, ওটা খাবো না বলে বায়না ধরতাম না। এরপরেও মা ঘরে থাকা উপকরণ দিয়ে বিভিন্ন রেসিপি করতেন। বিকেলে খেলতে যেতাম মাঠে। নানানরকম দেশি খেলা। গোল্লাছুট, হাডুডু, দাড়িয়াবান্ধা, বউচি, ডাঙ্গুলি, বড়া খেলা, ফুটবল ইত্যাদি শত খেলা খেলতাম। খেলতে গিয়ে বন্ধুদের সাথে ঝগড়া হতো, হাতাহাতি করতাম। আবার দুয়েকদিনে মিটেও যেতো। আবার একসাথে খেলা ও পড়ালেখা চলতো। এ নিয়ে বড় কোনো বচসা হতো না।

বাচ্চাদের ঝগড়া নিয়ে বড়রাও কোনো মাথা ঘামাতো না।

বন্ধের দিনে সারাদিন খেলতাম। কখনো কখনো বিলে যেতাম মাছ ধরতে। কই, শিং, মাগুর, গুতুম, বাইম, পুটি, বোয়াল, টাকি, কত শত মাছ। শিং মাছের গুতু খেলে মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে চিল্লাইতাম। খুব ব্যথায় কাতর হতাম। তাৎক্ষণিক প্রতিষেধক হিসেবে বিছকাটালি গাছ দিয়ে ক্ষতস্থানে বাড়ি দিতাম। কিংবা শিংয়ের গুতোর ক্ষতস্থানে প্রস্রাব করে দিতাম। গরম লাগলে আরাম লাগতো। তখন ডাক্তার খোঁজার রেওয়াজ ছিল না। গ্রামীণ এসব প্রতিষেধক কাজ করতো। পথ চলতে গিয়ে হাত পা কেটে গেলে দুর্বাঘাস চিবিয়ে লাগাতাম ক্ষতস্থানে। প্রাকৃতিক ওষুধে ভালোই কাজ করতো।

মাঝে মাঝে বাবা বাজারে নিয়ে যেতেন। দইওয়ালা থেকে দই বা সন্দেশ খাওয়াতেন, বাদাম বা হইমুল্লা কিনতেন আরেক দোকান থেকে। মিষ্টি কিনে দিতেন অন্য দোকান থেকে। সেসব খেতে খেতে বাড়িতে ফিরতাম। কোনদিন পেটে অসুখ হয়নি ওসব খেয়ে। সবাই সবাইকে চিনতেন। তাই খাবারও ভালো করে বানাতেন।

প্রতিবেশীরা খুব বেশি আসা যাওয়া করতো একে অপরের বাড়িতে। সারাদিন কথাবার্তা চলতো। সম্পর্ক ছিল খুব গভীর আর দেওয়া-নেওয়ার। কেউ পিঠা বানালে পাশের বাড়িতে পাঠাতো, কেউবা পোলাও কোর্মা করলে অন্যদের না দিয়ে খেতো না। এভাবে মিলেমিশে একাকার হয়ে চলতো। বিশেষ করে বিয়ে-শাদির প্রোগ্রামে প্রতিবেশীরা আত্মীয় স্বজনরা এসে হাজির হতেন। সব কাজ নিজ হাতে করতেন। গেট সাজানো, ঘর সাজানো, কনে সাজানো, বাজার করা, রান্না বান্না সব নিজেরাই করতেন। এসবের মধ্যে দিয়ে সকলের মধ্যে হৃদ্যতার এক অপার্থিব সৌন্দর্য্য দেখা যেতো।

এরকম সব ভালোই চলছিল। সবাই শান্তিতে আন্তরিকতায় কাটাচ্ছিল। পেটে ক্ষুধা থাকলেও মনে কোনো কষ্ট ছিল না। কাপড় কম পরলেও কোনো হাপিত্যেশ ছিল না। মুখে মুখে হাসি দেখা যেতো, সুখ-শান্তির আভা দেখা যেতো ঘরে বাইরে সমাজে ও দেশে।

এরপর একদিন বিশ্বে এলো এক বিশাল কিম্ভুতকিমার দৈত্য। দৈত্যের নাম 'পুঁজিশাঙ্গ'। তার ছিলো অনেক ছানাপোনা। এদের নামও ছিলো সেরকম উদ্ভট। মালিকভক্তি, লোভত্রাস, ভোগদাস, কামম্যাশ, লালসামা, লাভকান্তি, হিংসাত্রয়ী, ঈর্ষামনি, মধুকৈটভ ইত্যাকার সব নাম। এরা হলো নানান রূপের

নানান ঢঙের। বিচ্ছিরি সব দেখতে। এসব ছানাপোনারা ছড়িয়ে পড়লো দেশে দেশে, জেলায় জেলায়, ঘরে ঘরে, কোনাকাঞ্চিতে। সেই থেকে সব বদলে যেতে লাগলো। পাখিরা আর গ্রামে গ্রামে ডাকে না। ডাকবে কি গ্রামে এখন পাখিই নেই। কেউ লোভে পাখি খেয়ে ফেলে। কেউ বেশি ফসলের লোভে জমিতে কীটনাশক দেয়, সেসব খেয়ে পাখি মারা যায়। কেউ গরুকে মোটা করার জন্য ইনজেকশন দেয়, সেসব গরু মারা গেলে তা খেয়ে পাখিরা মারা যায়। এভাবে পাখি সব হারিয়ে যাচ্ছে। মানুষ নগদ লাভের আশায় গাছ সব কেটে ফেলছে। পাখিদের বাস করার স্থান কমে যাচ্ছে। অভয়ারণ্য আর নেই। তাই এখন আর পাখি ডাকে না। শিশুরা এখন আর পাখির ডাকে ঘুম থেকে ওঠেনা। মা-বাবার ধমক খেয়ে ঘুম থেকে ওঠে।

দৈত্যর ছানাপোনাদের জ্বালায় আর গ্রামে গ্রামে পুকুর বেশি দেখা যায় না। গণহারে ভরাট হয়ে যাচ্ছে অনেক পুকুর। যা আছে তাতে আর স্বচ্ছ পানি দেখা যায় না। সেখানে মাছের চাষ হয়। মাছকে কেমিক্যাল ফিড খাওয়ানো হয়, দ্রুত মাছ বড় হওয়ার জন্য। পুকুরের পানিতে তাই কাইট পড়ে থাকে। মুখে নিয়ে কুলি করার মতো পরিস্কার পানি থাকে না। কেমিক্যাল ভর্তি পানি থেকে মানুষ এখন দূরে থাকে। পানিতে এখন নিজের ছবি দেখা যায় না। মনে হয় মৃত্যুকূপ বা দৈত্যরা সব পানির নিচে।

দৈত্যরা সব পাল্টে দিচ্ছে। শিশুরা আর এখন খুব একটা মক্তবে যায় না। সবাই বাসায় বসে মোবাইল আর ট্যাব দেখে। বাবা-মায়েরা খুব ব্যস্ত সংসার আর গৃহস্থালি কাজে। ভোরবেলায় বাচ্চাদেরকে একা একা মক্তবে পাঠাতেও ভয় পায়। পথে পথে দৈত্যরা বদলোকদের দাঁড় করিয়ে রাখে। শিশুরা গুম হয়ে যায়, খুন হয়ে যায়, রেপ হয়ে যায় শুনতে শুনতে মানুষ এখন ভীত সন্তস্ত্র। তাই বাচ্চাকে মক্তবে পাঠায়না। এরই মাঝে যারা যায় মক্তবে তারাও কেউ কেউ ভিকটিম হয় মক্তবের হুজুরের হাতে। কালো লোমশ হাত যা করার নয় তাই করে। তাই বাচ্চারা ভয় পায়। মক্তবে যেতে চায় না। আগের মতো সুন্দর পূত-পবিত্র পরিবেশ বজায় নেই।

এ দৈত্যের ছানাপোনাদের দ্বারা আরও অনেক পরিবর্তন দেখা যায় দেশে দেশে। আগের মতো স্কুলে আসা যাওয়ার পথে আম জাম বড়ই কিছুই নেওয়া যায় না। মানুষ বাড়তে বাড়তে গাছ কাটতে কাটতে সব কমে গেছে। মানুষের আগের মতো গ্রহণ ক্ষমতা নেই। এখন কারো বড়ই গাছে ঢিল দিলে এ নিয়ে

লঙ্কাকাণ্ড ঘটে যায়। হয়ে যায় বাড়ি বাড়ি মারামারি। তাই বাচ্চারা ভয়ে তটস্থ থাকে। স্কুলে যায় আর আসে। মোড়ে মোড়ে সস্তা কেমিক্যেল দেওয়া চিপস বা লজেন্স কিনে খায়। এসব খেয়ে পেটে পোকা বানায়।

স্কুলের পরিবেশও আগের মতো নেই। এখন আর শিক্ষকরা বাচ্চাদের নাম মনে রাখেনা। নাম কেউ কেউ মনে রাখলেও বাচ্চাদের পরিবারের খবর জানে না। কেউ আসলো না কেন তার কারণ খুঁজতে কেউ যায় না। পড়া দেয় পড়া নেয় এই হলো ক্লাসের কারবার। ক্লাসে পড়া এখন কেউ বুঝিয়ে দেয় না। প্রাইভেট ও কোচিংয়ে গেলে পড়া বুঝিয়ে দেবে—এ কারবারে নেমেছে অনেক শিক্ষক। আগের মতো বাচ্চাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে শিক্ষকরা খবর নেয় না। কথায় কথায় বাচ্চাদের নানান অজুহাতে পেটানো শুরু হয়েছিল। তা থামাতে সরকার বেত মারা বন্ধ করেছে বটে, তবে অন্যান্য সূক্ষ্ম নির্যাতন বা অনিয়ম বন্ধ করতে পারেনি। দৈত্যর ছানাপোনারা নানানরূপে দেশের মানুষের মনের ভিতর ঢুকে পড়েছে। সব ধরা যায় না, দেখা যায় না, ছোঁয়া যায় না। সবাই নগদের পেছনে ছুটছে। আদর্শ বা সম্মানের জন্য কারো কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। বাচ্চারা স্কুলে যেতে এখন আনন্দ পায় না। সমাজে এক ভয়ার্ত অস্বস্তিকর পরিবেশ বিরাজ করে। জোর করে বাবা-মা পাঠায়, জোর করে স্কুলও চলে। কোথাও কোনো স্বতস্ফুর্ততা নেই। ভালোবাসা বা আন্তরিকতা নেই। দৈত্যের ছানাপোনারা সব কুঁড়ে কুড়ে খেয়ে ঝাঝরা করে ফেলেছে।

বিকেলে খেলার পরিবেশও আগের মতো নেই। মোবাইল, ভিডিও গেমস, অ্যাপস জায়গা করে নিয়েছে আগের দেশি সব খেলার। যাদের টাকা আছে তারা এসব খেলে, যাদের টাকা নেই তারা এসব পায় না বলে মন খারাপ করে বসে থাকে। সাথে এসেছে ব্যাডমিন্টন, ক্রিকেট, ফুটবল। আগের মতো বিনাপয়সার খেলা ডাঙ্গুলি, হাডুডু, দাড়িয়াবান্ধা বা গোল্লাছুট নেই। গ্রামের উঠান ছোট হয়ে আসছে। মানুষ যে হারে বেড়েছে মাঠ সে হারে হয়নি। তাই বাচ্চাদের খেলার স্থান পর্যাপ্ত নেই। শহরে তো খেলার জায়গাই নেই। দৈত্যদের দ্বারা তাড়িত হয়ে মানুষ সব ছুটছে অস্বাস্থকর পরিবেশের দিকে। বাচ্চারা এখন ঘরে বসে থাকে। মোবাইল টিপে, গেমস খেলে। খেয়ে খেয়ে মোটা হয়, শারীরিক কসরত না থাকায় ফিটনেস ছাড়াই বড় হচ্ছে এখনকার নতুন প্রজন্ম।

এখন আর বন্ধের দিনে মাছ ধরতে যায় না বাচ্চারা। উন্নয়নের জোয়ারে

রাস্তাঘাট হতে হতে বিল বা হাওড়ের পানিপথ সব বন্ধ হয়ে গেছে। এখন আর বিলে ঝিলে মাছ পাওয়া যায় না। মানুষ বাড়ছে, বাড়ছে বাড়িঘর। জমি বিল ঝিল সব ভরাট হচ্ছে অপরিকল্পিতভাবে। আগের সেই দেশি মাছ এখন খুব কম। নাই বললেই চলে। যাই কিছু থাকতো জমিতে কিটনাশক ব্যবহারের ফলে মাছের বংশবৃদ্ধি প্রক্রিয়া ব্যহত হয়েছে। মাছের ডিম থেকে মাছ হওয়ার আগেই কিটনাশকের কারণে বিস্তার বন্ধ হয়ে যায়। তাই বাচ্চারা এখন বিলে ঝিলে গেলে মাছ পায় না।

এখন বাবার সাথে বাচ্চারা বাজারে গেলে প্লাস্টিকের খেলনা কেনে। আর দোকান থেকে কেনে চিপস, আচার আর চকলেট। দৈত্যের ছানাপোনার মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়েছে ক্যামিকেল আর অস্বাস্থ্যকর সব খাবার। যা খেয়ে বাচ্চারা অসুস্থ হয়ে পড়ছে। অনেক বাচ্চা কোষ্ঠকাঠিন্য বা পেটের পীড়ায় ভুগছে, কেউ বা মরণব্যাধিতে আক্রান্ত হচ্ছে।

প্রতিবেশীদের মধ্যেও আর আগের মতো সম্পর্ক নেই। সবাই এখন ঘরে বসে গোসল করে। পুকুর পারে বসে কথা বলতে বলতে গোসল করা বা বাসন মাজার চিত্র দেখা যায় না। প্রতিবেশীরা আর আগের মতো হুট করে একে অপরের বাসায় যায় না। সবাই ভাবে ও যেহেতু আসেনাই, আমিও যাবো না কিংবা ও একবার দাওয়াত দিয়েছে, তাই আমিও একবার দাওয়াত দিব। এরকম ফরমাল রিলেশনের ভিড়ে আগেকার দহরম মহরম সম্পর্ক হারিয়ে যাচ্ছে। সবাই দরজা বন্ধ করে টিভি দেখে, সিরিয়াল দেখে, ইউটিউব ও ফেসবুক দেখে। আন্তরিকতা ও সহজ সম্পর্কগুলো হারিয়ে গেছে।

বিয়ে-শাদিতেও এখন আর প্রতিবেশীদের সহযোগিতা লাগে না। ডেকোরেটর ভাড়া করে। ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট ভাড়া করে। প্রতিবেশী আত্মীয়রা শুধু নির্ধারিত সময়ে খেতে আসে আর মেকি ছবি তোলায় পোজ দেয়, চলে যায়। গিফটের পরিবর্তে খাম দিয়ে যায়। বিয়ে বাড়ির কাজকর্মে, আনন্দ উল্লাসে ঘটন অঘটনে, হাজার অনুষঙ্গে কেউ সশরীরে জড়িত হয় না।

এভাবে দৈত্যরা একে একে সব পাল্টে দিচ্ছে। ঘরে ঘরে মেকি উন্নয়ন হয়েছে। ফাঁকে ফাঁকে দৈত্যর ছানারা বাসা বেঁধেছে। মানুষের শান্তি উবে যাচ্ছে, বাচ্চাদের উল্লাস হ্রাস পেতে পেতে নেই হয়ে যাচ্ছে। কোথাও আন্তরিকতা নেই, হৃদ্যতা নেই, প্রশান্তি নেই, এটা নেই ওটা নেই। সব নেই

এর এক কালো গহ্বরে হারিয়ে যাচ্ছে বাস্তব রূপকথার এ দেশটি। গল্প শেষ! বলতে বলতে জালাল ঝাপসা চশমা চোখ থেকে নামায়।

গল্প শেষ হলে মেয়ের মন খারাপ হয়ে যায়। বাবার ঝাপসা চোখ দেখতে দেখতে মেয়েটি ছলছল চোখ নিয়ে অন্য ঘরে চলে যায়। ছেলে 'পঁচা গল্প আর মন খারাপ করা গল্প বলেছো কেন?' বলে বাবাকে একটু অনুযোগ করে মেজাজ খারাপ করে বালিশে মুখ গোজে।

শূন্য জীবনে ভালোবাসা

অনেককাল আগের কথা। নিজ গ্রাম থেকে ৪ ক্রোশ দূরের এক গ্রামে লজিং থাকে শরীফ মাস্টার। সব ঠিকঠাক চলছিল। ওই গ্রামের যে বাড়িতে শরীফ থাকে, ঠিক তার পাশের বাড়িতে ছিল এক লোক। টিবি রোগী। বয়স বেশি হবে না, বড়জোর ত্রিশ। বউ আছে, একটা বাচ্চাও আছে। গরীব তাই অর্থকষ্টে খেয়ে না খেয়ে দিন কাটায়। টিবি রোগের চিকিৎসা করতে না পারায় শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছে লোকটি। হাড়-গোনা যায় সব, চোখও কোটরের ভেতরে ঢুকে গেছে। দেখলেই ভয় লাগে। বউ তাকে ছেড়ে চলে যাবে যাবে করছে, বাবা মাও দেখভাল করে না।

একদিন শরীফ মাস্টার ওযু করতে যায় টিউবওয়েলে। টিউবওয়েলটি দুই বাড়ির মাঝখানে। টিউবওয়েলের পাশেই টিবি রোগীর মায়ের রান্নাঘর। ওখান থেকে কথাবার্তার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। ওযু শেষে শরীফ মাস্টার কালিমা শাহাদত বিড়বিড় কর পড়ছিলেন। তখনি শুনতে পায়। টিবি রোগীর মা বলতেছে 'যেটা দিছি সেটাই বেশি, তুই না খেয়ে থাকবি, না খেয়ে মরতে পারিস না? কোনো কাজ করার তাগদ নেই, সারাদিন কেবল খাই খাই।' জবাবে টিবি রোগী খুবই ম্রিয়মাণ গলায় বলল, 'আমি তো সারাদিন খাই খাই করি না। আমি তো বুকের ব্যথায় খেতেই পারি না। দুবেলা খাবার দাও, তাও কম। কাশতে কাশতে আমার দম যায়। আমার শ্বাসকষ্ট হয়। তোমরা সবাই খেলে গরম গরম রুটি আর আলু ভাজি। আর আমাকে দিলে গতকালের শুকনা আটার রুটি। শুকিয়ে শক্ত হয়ে আছে। আমি গিলতে পারি না। পানি দিয়েও গলা দিয়ে নামে না।' জবাবে তার মা খেঁকিয়ে ওঠে, 'কাজ করতে পারিস না, বউ বাচ্চা নিয়ে পড়ে আছিস, খাওন যা দেই তাই বেশি।' শরীফ মাস্টার

আড়চোখে দেখতে পায় টিবি রোগীর দুগাল বেয়ে অশ্রু ঝরছে। দারিদ্র্য আর অসুস্থতার কষাঘাতে মা-সন্তানের সম্পর্কও কত রুঢ় হতে পারে—তা ভাবতেই শরীফ মাস্টারের চোখ ছলছল করে।

টিবি রোগীর আরও কয়েকজন ভাই বোন আছে। যারা তাগড়া, আয় করে, সামর্থবান। তাদের নিয়েই ব্যস্ত বাবা-মা। টিবি রোগী হলো তাদের বড় ছেলে। তার দিকে তাকানোর সময় নেই কারো। টিবি রোগীর থাকার ঘর নেই, ঘুমানোর জায়গা নেই। আসলে তার জন্য কিছুই নেই। মাঘ মাসের শীতে কাশতে কাশতে তার জীবন যায় যায় যায় অবস্থা। তবু তার জায়গা গরুর গোয়ালের একটি অংশে, একপাশে মেঝেতে। কোনোরকমে দিন যাচ্ছে। টিবি রোগীর বউও ওর সাথে খারাপ ব্যবহার করে। একদিন শরীফ মাস্টার পড়ার টেবিল থেকেই দেখতে পায়, দূরের আমগাছটির নিচে দাঁড়িয়ে টিবি রোগীর বউ। কোলে বাচ্চা নিয়ে হেসে হেসে কথা বলছে পাশের বাড়ির এক লোকের সাথে। কী জানি কথা হচ্ছে কে জানে! তবে উভয়েই আনন্দে মেতে আছে। হতে পারে গোপন সম্পর্ক বা গোপন সম্পর্ক না হোক কথাবার্তার ধরনে তাদের মধ্যে আত্মিক সংশ্লেষটা বোঝা যায়। এরই মাঝে লাঠিতে ভর করে হাঁটতে হাঁটতে টিবি রোগী হাজির আমগাছতলায়। দেখেই টিবি রোগীর বউ শক্ত হয়ে যায়। কেন ঘর থেকে বের হলো, কেন এত নড়নচড়ন ইত্যাদি নিয়ে হুল ফুটিয়ে খোঁচা দিয়ে কথা বলছে। পাশে দাঁড়ানো লোকটি চলে যায়। তারপরও টিবি রোগীর বউয়ের কথার হুল ফোটানো বন্ধ হয় না। অকেজো বেকার পুরুষ কতটা অবহেলিত হতে পারে, আর কতভাবে অপমানিত হতে পারে তা টিবি রোগীকে না দেখলে শরীফ মাস্টার বুঝতেই পারতো না।

শরীফ মাস্টার মনে মনে ভাবে টিবি রোগীর সাথে কি তার বউয়ের শারীরীক সম্পর্ক হয়? শরীরের যে অবস্থা তাতে টিবি রোগী তা পারার কথা না। টিবি রোগীর বউ তবে কি নিয়ে থাকবে? স্বামীর শরীর নেই, আয় নেই, শাশুড়ি, ননদ ও দেবরদের প্রতিনিয়ত অপমান সহ্য করে কোনোরকমে টিকে আছে। এরপরও প্রেম কোথা থেকে আসবে টিবি রোগীর প্রতি! শরীফ মাস্টার জেনেছে যে কয়েকবছর আগেও টিবি রোগীর শরীর ভালো ছিল। ঢাকাতে বেকারির হকার ছিল। মাসে মাসে ভালো আয় করতো। সংসারের খরচ সব সেই দিতো। ভাইবোনদের পড়ালেখার খরচও। আজ টিবি রোগে মৃত্যুপথ যাত্রী হওয়ায় তার কোনো মূল্য নেই কারও কাছে।

শরীফ মাস্টার লোকটিকে দেখে, মায়া লাগে। কষ্ট লাগে। জগত সম্পর্কে বুঝতে পারে না, তবু কেমন ভাবনা এসে তার মধ্যে ভর করে। বই খাতায় যা পড়ে, মসজিদের বয়ানে যা শোনে, আর স্যারেরা বা মুরব্বিরা যা বলে তার সাথে কোনো মিল পায় না। ভেতরে ভেতরে তর্কযুদ্ধে লিপ্ত হয় শরীফ মাস্টার। শরীফ মাস্টারের কিশোর মন কষ্টে কাঁপে, ক্ষোভে ফাটে। কিন্তু কিছু করার নেই।

এভাবেই একদিন প্রতিবেশী টিবি রোগী মারা যায়। তারে দাফন কাফন করার তেমন লোকও পাওয়া যায়নি। কারো চোখে কোনো কান্নাও চোখে পড়েনি। বিলাপের আওয়াজ কানে আসেনি। সে যেন মরে গিয়ে সবাইকে বাঁচিয়ে দিয়ে গেল। এমন অবস্থার মধ্যেই ধর্মীয় নিয়মে তার দাফন কাফনের ব্যবস্থা হলো। জানাযায় শরীফ মাস্টারসহ কয়েকজন লোকই ছিল। শরীফ মাস্টারের মনে আশ্চর্যই লেগেছে। এত কম মানুষ নিয়ে জানাযা সে গ্রামে কখনো পড়েনি। ইমাম সাহেবও কোনোরকমে জানাযা পড়িয়ে বিদায়। যেহেতু হাদিয়া দেওয়ারও কেউ নেই। আজ বড়লোক কেউ হলে, জানাযা পড়িয়ে কবরস্থানে গিয়ে লম্বা দোয়া হতো। একদফা দোয়া নয়, তিন দফা দোয়া হতো। তিনটাই লম্বা লম্বা সুরে নানান ইনানি-বিনানি দোয়ার আয়োজন হতো। স্তুতি ও দোয়ায় মৃতের বাড়ির কোনো কিছু বাদ পড়তো না। লম্বা টানে হুজুর ঘণ্টা লাগিয়ে দিতো। কিন্তু এখানে যেহেতু হাদিয়া পাওয়ার সম্ভাবনা নেই, সেহেতু হুজুরের তাড়া বেশি। জানাযা শেষে দ্রুত কেটে পড়েছে হুজুর। অন্যরাও। দুতিনজন লোক মিলে কোনো রকমে মাটিচাপা দিয়েছে। যাক, বেচারা মরে গিয়ে বেঁচেছে। মাটির নিচে নিশ্চয়ই শান্তিতে আছে। জীবিত থাকতে যে অবহেলা আর নিষ্ঠুরতা সে দেখেছে, তাতে তার মরে গিয়েই ভালো হয়েছে। প্রতিদিন দেখতে দেখতে শরীফ মাস্টার বিচলিত ছিল। শরীফ মাস্টারও কেমন যেন একটু মুক্তি মুক্তি অনুভব করলো।

যাক ঘটনা এখানেই শেষ না। তখনকার সমসাময়িক ঘটনাগুলোর মধ্যে ওই গ্রামে একটি ঘটনা ঘটে। গ্রামের দুই গোষ্ঠীতে ঝগড়া হয় এবং রাহাজানি ও মারামারিতে একজন খুন হয়ে যায়। একজন ভালো মানুষ, নির্দোষ লোক খুন হন। যে লোকটি খুন হন তার ছেলে সন্তান নেই। দুটি মেয়ে সন্তান। কিশোরী। বাবার মৃত্যুতে কিশোরী দুটো এতিম হয়ে যায়। তাদের মা বিধবা হিসেবে অকূল সাগরে পড়ে। বিধাতার বিচার বুঝতে পারে না। গ্রামের

ক্ষমতাওয়ালাদের ঝগড়া। সেই ঝগড়ার মাঝে তার স্বামী কেন মারা গেলো তা ভেবে পায় না। এত লোক ঝগড়া করলো। দা বল্লম টেটা নিয়ে অংশ নিল। তাদের কেউ খুন হলো না। খুন হলো যে কারো সাতে পাঁচে নেই। সাধারণ নিরীহ মানুষ। যার দুটো মেয়েকে দেখবার বা খাওয়াবার জন্য কেউ নেই। গ্রামের সবাই অবাক হয়, দু:খ পায়।

খুন হওয়া পক্ষ মামলা করে। মামলায় খুনিপক্ষ ফেঁসে যায়। অনেক বড় বড় লোক আসামি। গ্রামের দুপক্ষেই অনেক বড় বড় লোক, টাকাওয়ালা আছে। জাতীয় পর্যায়ের ধনী লোক। লক্ষ লক্ষ টাকা যাচ্ছে কিন্তু কোন সমাধান হচ্ছে না। খুন করা পক্ষ কোনভাবেই মামলায় সুবিধা করতে পারতেছে না।

এভাবেই দিন কাটছিলো। গ্রামের মানুষের মেল-মিটিং, বাজার-সওদায়, পথে ঘাটে এ নিয়ে বিশাল আলোচনা। মামলায় কোন পক্ষ এগিয়ে বা পিছিয়ে, কার বেশি টাকা, কার কম টাকা, উপরে কার লোক বেশি, কার লোক কম—ইত্যাকার নানান বিষয়ে হাজারো কল্পকাহিনি। হঠাৎ একদিন শরীফ মাস্টার শোনে, ম্যাজিস্ট্রেট আসবে, পুলিশ আসবে, টিবি রোগীর লাশ উত্তোলন হবে, ইত্যাদি। সে কিছুই বুঝতে পারে না। ঘটনা কি? যে মানুষ জীবিত থাকতে কেউ তাকাতো না, খেতে দিতো না, চিকিৎসা ছিলো না, মরে যাওয়ার পর তার লাশ এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেলো যে রাষ্ট্র আসতেছে! ম্যাজিস্ট্রেট আসছে, পুলিশ আসছে। ঘটনা কী!

পরে যা শুনলো, দেখলো ও বুঝলো তা আর ভাষায় প্রকাশের না। ওই যে গ্রামের দুপক্ষের মারামারিতে একপক্ষ খুনের মামলার আসামি তারা মামলায় সুবিধা করতে পারতেছিল না। তাই তারা প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে নানান সুযোগ খুঁজতেছিল। তাদের পক্ষের কেউ টিবি রোগীর মা-বাবার সাথে কন্টাক্ট করেছে। চুক্তি অনুসারে বাবা-মা গিয়ে বলেছে যে 'তাদের বড় ছেলেকে (টিবি রোগী) হত্যা করা হয়েছে।' এবং এ মর্মে বিরোধী পক্ষকে ফাঁসানোর জন্য একটি মামলা করেছে বাবা-মা বাদী হয়ে। বিরোধী পক্ষ আদালতকে জানিয়েছে ওটা স্বাভাবিক টিবিজনিত মৃত্যু। আদালত আদেশ দিয়েছে তদন্ত করার জন্য। সেই মামলার কারণে আদালতের আদেশে ম্যাজিস্ট্রেট/ পুলিশ আসতেছে লাশ তুলতে; এবং তুলেছে। হাজার হাজার লোক, নেতা-পাতিনেতা, সাংবাদিক, লোকে লোকারণ্য। শরীফ মাস্টার দেখে আর ভাবে মরার সময় জানাযায় লোক ছিল না কয়েকজন। আর এখন লাশ উত্তোলনে

হাজার হাজার লোক। লাশ তোলার দৃশ্য সবাই দেখতেছে। টিবি রোগীর লাশ তুলে মাটির উপরে রাখা হলো। কবরস্থান নয়। যে পরিত্যাক্ত জমিতে মাটি দেওয়া হয়েছিল সেখান থেকেই লাশ তুলে জমিতে রাখা হলো। লাশ দেখা ও কাটাছেঁড়া ও স্যাম্পল সংগ্রহে ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ, ডাক্তার ব্যস্ত। টিবি রোগীর আত্মাটি ভাবলো যাই এই ফাঁকে একটু মাকে দেখে আসি।

টিবি রোগীর মা তখন নামাজের বিছানায় বসে আল্লাহকে ডাকতেছে। আল্লাহর কাছে ছেলের জন্য দোয়া করায় ব্যস্ত। আল্লাহ যেন তার ছেলেকে মাফ করে দেয়। মা হয়ে মিথ্যা খুনের মামলা দায়ের করেছে—এ অপরাধ যেন আল্লাহ পাক মাফ করে দেন। সেই দোয়াও তিনি করছেন। দরজা বন্ধ করে কেঁদে কেঁদে বিধাতার নিকট হাত তুলে দোয়া করছেন। মানুষ এমনই। জঘন্য সব অপরাধ করবে আর তারপর আল্লাহর কাছে তার জন্য দোয়া করবে মাফ করতে। এমনকি অপরাধ চলমান রাখা অবস্থাতেই মানুষ আল্লাহর নিকট দোয়া করে। নিরাপত্তা চায়, নাজাত চায়, মুক্তি চায়, নিষ্পাপ হতে চায়। ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করেই টিবি রোগীর মা দোয়া, কান্না বা মায়াকান্না করে যাচ্ছিল। তখনই টিবি রোগীর আত্মা এসে ঘরে হাজির। হঠাৎ টিবি রোগী কথা শুরু করে—

'মা, তুমি কীভাবে পারলে আমার লাশ ব্যবহার করে এরকম মিথ্যা মামলা করতে? এখন যে ওরা আমার লাশ তুলে কাটাকাটি করতেছে আমার কি কষ্ট হচ্ছে না? তোমার কি ভালো লাগছে? ওরা নাকি আমার কলিজা নিয়ে যাবে। বায়োপ্সি টেস্ট করবে। আমার কলিজা তো জীবিত থাকতেই পুড়ে অঙ্গার হয়ে গিয়েছিল। তোমরা যে আচরণ আমার সাথে করেছো তাতে আমার কলিজা কালো কুচকুচে হয়ে গেছে। আমি তোমাদের সবাইকে মুক্তি দিতে মরে গিয়েছিলাম। মরে গিয়ে নিজেও বেঁচেছিলাম, তোমাদেরও বাঁচিয়েছিলাম। মুক্তি পেয়েছিলে তোমরা। তবে এখন কেন এই মিথ্যা মামলা? আচ্ছা ওরা যদি কলিজা নিয়ে গিয়ে জেলা সদরে বায়োপসি করে ওরা কি জানতে পারবে, কারা আমার কলিজাকে এমন ক্ষতবিক্ষত করেছে? তুমি, আমার মা হয়ে তা করেছো, আমার ভাই, আমার বোন, আমার বউ, সবাই মিলে আমাকে তিলে তিলে হত্যা করেছো। যদি বায়োপসি টেস্টে সত্যি প্রতিবেদন ধরা পড়ে তবে তো তোমরা ফেঁসে যাবে মা।'

ছেলের কণ্ঠ শুনে ভয় পেয়ে যায় টিবি রোগীর মা। ঘরের এদিক ওদিক

তাকায়। কেবল কথা শুনতে পায়, কাউকে দেখতে পাচ্ছে না। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে দরজা খুলতে যায়। কিন্তু সেই পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। এর আগেই বেহুশ হয়ে পড়ে যায়। টিবি রোগীর আত্মা মায়ের বেহুশ হওয়া দেখে নিজের কবরের কাছে ফিরে যায়। কাটাকুটি শেষ। পুনরায় দাফনের কাজ শুরু। আত্মাটি আবার কবরে ঢুকবে নাকি আকাশে চলে যাবে এসব ভাবতে ভাবতে দোদুল্যমানতায় সময় পার করছে।

আর আশেপাশের লোকজন টিবি রোগীর মাকে কোথাও না পেয়ে ঘরে গিয়ে নক করে। অনেক পরে দরজা ভেঙে তাকে উদ্ধার করে। চোখে মুখে পানি ছিটিয়ে দেয়। টিবি রোগীর মার জ্ঞান ফিরে। পাশে শতলোক দেখলেও কোনো প্রশ্নের উত্তর তিনি দিতে পারেন না। সবার কাছে তিনি সব লুকালেও নিজের কাছে তিনি কিছুই লুকাতে পারছেন না। হাউমাউ করে কেঁদে ভেঙে পড়েন টিবি রোগীর মা।

পরে আবার ওযু করে নামাজের আসনে বসে। দোয়া দরুদ পড়ে। আল্লাহর কাছে দুই হাত তুলে প্রার্থনা করছে। 'হে আল্লাহ আমার ছেলেকে তুমি মাফ করে দাও। আমার ছেলেকে তুমি বেহেশত নসিব করে দাও। দুনিয়াতে আমার ছেলে অনেক কষ্ট করেছে, এখন মারা যাবার পরেও তার কলিজা কাটা হচ্ছে। তুমি তার কষ্ট লাঘব করে দাও। তুমি তো জানো আমি ছিনাল মা। ছেলের জন্য আমার মন কাঁদতো। ছেলের কষ্ট আমি সইতে পারতাম না। তাইতো ছেলের সাথে মাঝে মাঝে রাগারাগি করতাম। অভাবের সংসার। সবাইরে খাবার দিয়ে তারপর আমরা এই ছেলেকে খাবার দিতাম। সবাই যেহেতু কাজ করে তাই সবাইকে খাবার দিতে হতো। সে যেহেতু বসে থাকতো সেহেতু ওর উপর সবার রাগ বা বিতৃষ্ণা ছিল। আমি তো মা আমার তো বিতৃষ্ণা নেই। আমি চারপাশ সামলাতে পারতাম না বলেই রাগে গজগজ করতাম। আমার ছেলেটা আমার কাছ থেকে অনেক কষ্ট পেয়েছে। এখন বাকি সন্তানদের নিয়েও অনেক কষ্টে দিন কাটাচ্ছি। আর এ মামলাতো আমি করতে চাইনি। আমি জানিও না। সর্দার-মাতব্বররা বুদ্ধি নিয়ে এসছে, তাই রাজি হয়েছি। আমার এক ছেলে গেছে আরও ৪ ছেলে ও ৩ মেয়ে আছে। ওদের নিয়ে খুব কষ্টে দিন কাটাই। এক ছেলেকে বিদেশ পাঠাবে আর নগদ তিন লাখ টাকা দিবে এ আশাতেই মামলাতে রাজি হলাম। ভাবলাম যে, যে ছেলে গেছে সেতো গেছে। বাকিদের নিয়ে আর কষ্ট না করি। না খেতে খেতে অভাবে

অভাবে আমার যে মনোবল ভেঙে গেছে। ছেলেটার খুব কষ্ট হচ্ছে। তার কলিজা নাকি কেটে নিয়ে যাবে। তুমি গাফুরুর রাহিম, তুমি মাফ করে দাও। তুমি রাহমানির রাহিম তুমি আমাদের উপর রহমত নাযিল করো। তুমি তো কষ্ট লাঘবকারী, তুমি আমার ছেলের কষ্ট দূর করে দাও। মা হয়ে ছেলের উপর ভিত্তি করে মামলা দিয়েছি। এটা বড় অন্যায় হয়েছে আমার, আমাকে মাফ করে দাও। আমার আরও সাত সন্তান রয়েছে। সকলের আরামের জন্য আমি এ অন্যায়টুকু করেছি। আমার এ অন্যায় তুমি মাফ করে দাও। আমার সন্তানের কবরে শান্তি এনে দাও।'

দোয়া করতে করতে কান্না করতে করতে টিবি রোগীর মা আবারও মূর্ছা যায়। প্রতিবেশীরা এগিয়ে আসে। মাথায় পানি ঢালে। কেউ বলে, 'আহারে, ছেলের জন্য শোকে কানতে কানতে অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে।' কেউ বলে, 'কত ঢঙ আর অভিনয়। মিথ্যা মামলা করেছে ছেলের নাম দিয়ে, আবার এখন ছেলের জন্য অজ্ঞান হয়। কত তামাশা দেখবো দুনিয়ায়! হাহ!'

এদিকে শরীফ মাস্টার কিছুটা অবাক হয়ে, কিছু বিহবল হয়ে লাশ তোলা দেখতেছিল। লাশ পঁচে গেছে। শুকানোর পথে। এ জিনিস তুলে আর কী পাবে বা পাবে না, আল্লাহ মালুম। তবু রাষ্ট্রের নিয়ম আর টাকাওয়ালাদের মামলার খেলা। রাষ্ট্রযন্ত্র এমনই। খেলা দেখাতে পছন্দ করে। আর আমজনতাও তেমনি খেলা দেখতে পছন্দ করে। শরীফ মাস্টার স্বগতোক্তি করে, 'আহা মানুষ, আহা পৃথিবী, আহা সৃষ্টির সেরা জীব!'

পরে শরীফ মাস্টার জেনেছিল যে, মিথ্যা মামলার বিনিময়ে বাবা-মা নগদ টাকা পেয়েছে, এবং এক ছেলেকে বিদেশ পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। টিবি রোগী জীবিত থাকতে যে বাবা-মা খবর নিতো না ঠিকমতো, সেই বাবা-মা জীবিত সন্তানদের ভবিষ্যত গড়ার জন্য যে চলে গেছে তার সব জলাঞ্জলি দিয়েছেন। অভাবের সংসারে সব ভালোবাসাই নিয়তির নির্মমতার শিকার হয়। এখানেও হয়তো তাই হয়েছে।

আরও অভাবনীয় বিষয় হলো টিবি রোগীর স্ত্রী বা সন্তান একদিন এসে হাজির। টিবি রোগী মারা যাবার পরে তাদের এ বাড়িতে জায়গা হয়নি। তাই বাধ্য হয়ে চলে গিয়েছিল বাপের বাড়ি। এখন তার লাশ নিয়ে মামলা হয়েছে সেখান থেকে টাকা পেয়েছে। সেই টাকার ভাগ নিতে হাজির হয়েছে স্ত্রী ও সন্তানরা। কিন্তু টিবি রোগীর বাবা মা ভাইবোনেরা এই মহিলাকে বাড়িতেই

ঢুকতে দিতে রাজি না। মহিলা প্রতিবেশীদের বাড়ি বাড়ি যায়। বিচার দেয়। কিন্তু কোনো প্রতিবেশী এগিয়ে আসে না। কারণ প্রতিবেশীরা বিষয়টাতে বিরক্ত। সামনে কিছু না বললেও মনে মনে পুরো মামলা ও আর্থিক লেনদেনের ঘটনা তাদের হতবিহ্বল করেছে। মহিলা সর্দার মাতব্বরদের কাছে যায়। সর্দার মাতব্বর সবাই টাকার ভাগ পেয়েছে। সুতরাং কেউ মহিলাকে পাত্তা দেয় না। ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে আশ্বাস দেয়। বলে, পরে আসতে, পরে ব্যবস্থা করে দেবে। এভাবেই দিন যায়, রাত যায়। স্ত্রী সন্তানরা উক্ত মিথ্যা মামলা থেকে প্রাপ্ত টাকার কোনো ভাগ পায়নি। যেহেতু চুক্তি হয়েছে বাবা-মার সাথে আর মামলা করেছে বাবা-মা, সেহেতু টিবি রোগীর স্ত্রী সন্তান কোনো সুবিধা পায়নি। কয়েকদিন দ্বারে দ্বারে ঘুরে টিবি রোগীর স্ত্রী চলে যায় বাপের বাড়ি।

যাওয়ার সময় যে পরিত্যাক্ত জমিতে টিবি রোগীর কবর ও সেই কবরের পাশ দিয়েই যায়। টিবি রোগীর স্ত্রী হঠাৎ করে থেমে যায়। কে যেন তার হাত ধরে টানছে। হাত ছাড়াতে পারছে না। হাতটি তার স্বামীর হাতই মনে হচ্ছে। ভয় পাচ্ছে আবার ভালোও লাগছে। ফিসফিস করে কী যেন কথা বলছে।

: কেমন আছো লালবানু? প্রশ্ন শুনে লালবানুর মুখ দিয়ে কথা বের হয় না। ভয় পায়। সত্য ও বাস্তবতার এক মর্মজালে নিজেকে স্তম্ভিত ও নির্বাক লাগে।

: টিবি রোগীর কণ্ঠ আরও শোনা যায়।

: তোমাকে আমি ভালোবাসি লালবানু। ভালোবাসতামও। ভালোবেসেই দুটি সন্তান নিয়েছিলাম। বিধাতা আমাকে কেন টিবি রোগ দিল আর কেন অক্ষম বানিয়ে দিলো জানি না। যখন আমার শরীর ভালো ছিলো, তখন তোমার প্রেম ও আদিখ্যেতা দেখে আমি খুব আপ্লুত হতাম। ভাবতাম, আমাকে কত ভালোবাসো তুমি। কিন্তু যখনই শরীর অসুস্থ হয়ে শারীরিক, মানসিক ও আর্থিকভাবে অক্ষম হয়ে গেলাম তখনই তুমি আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে। ভাই বোন সবাই না হয় মুখ ফিরিয়ে নিল। কিন্তু তোমার আচরণ ও অবহেলা আমি কিছুতেই নিতে পারছিলাম না। বিশেষ করে পাশের বাড়ির ছেলেদের সাথে তোমার আচরণ, কথা ও সম্পর্ক আমাকে বিদীর্ণ করতো। আমি মরতে চাইতাম প্রতিদিন। আমার বাঁচতে ইচ্ছে করতো না একদিনও। বিধাতার কী লীলা! যে আমাকে তোমরা দেখতে পারতে না। সেই আমাকে নিয়েই এখন মামলা। আমাকে পুঁজি করে তোমরা সবাই বড়লোক হতে চাচ্ছো। আমি মরে যাওয়ার পরেও তোমাদের আর্থিক বা বৈষয়িক ইস্যু হয়ে থাকলাম। তোমাদের

অন্তরে ঠাঁই হলো না, ঠাঁই হলো না ভালোবাসায়। আচ্ছা লালবানু, মানুষ এত নিষ্ঠুর হয় কী করে?'

এসব শুনতে শুনতে লালবানু হাত ছাড়াতে চেষ্টা করে। কিন্তু পারে না। টানতে টানতে হয়রান হয়ে হঠাৎ করে অজ্ঞান হয়ে যায়। পরে পাশের বাড়ির লোকেরা এসে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। হাসপাতালে ভর্তি করে। রক্তশূন্যতা ও অনুশোচনাজনিত মানসিক রোগী হিসেবে চিহ্নিত হয়। ডাক্তারের চিকিৎসা পেয়ে ভালো হয়ে যায়। সময় মানুষকে সব ভুলিয়ে দেয় আর পরিস্থিতি মানুষ দিয়ে সব করিয়ে নেয়।

তারপর দিন যায়, বছর যায়, মামলা বইতে বইতে দুইপক্ষ হয়রান হয়ে আসে। থানা পুলিশ, উকিল, আদালত, স্থানীয় মাতবর, সালিশ, টাউটদের সবার পকেট ভারী হয়। দুই হোমড়াচোমড়া কোটিপতির কোটিখানেক খরচ হয়। এভাবে সবার খায়েশ আয়েশ সব মেটে। দৌঁড় শেষ হয়। কয়েকবছর পরেই গ্রামে শান্তি ফিরে এসেছিল। দুই গোষ্ঠীর সমাজ মিলেমিশে বাজার করে, জেয়াফত খায়, সামজিক আয়োজন করে, মাহফিলে শরিক হয়। সব স্বাভাবিক। কিন্তু ওই সময়ে টিবি রোগীকে কেন্দ্র করে মানুষের মনে ও সমাজের চোখে যে মিথ্যা-প্রলোভন আর নিষ্ঠুরতার ছাপ রেখে গেছে, তা আজও রয়ে গেছে। আর রয়ে গেছে বলেই শরীফ মাস্টারের ওই সময়ের কিশোর কচি মন আজ পরিপক্ক হবার পরেও তা ভুলতে পারেনি।